টাকার কথা

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

উৎসর্গ

যিনি
বিমাতার গৃহে অনাদৃতা ভাষা-জননীকে
সমাদরে
সম্মানের আসন দিয়া
বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে
নূতন অধ্যায় খুলিয়া গিয়াছেন
যিনি
বাঙ্গালার শিক্ষা-আয়তনে
বাঙ্গালীর ভাবাদর্শকে
নূতন মন্ত্রে
সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন
সেই
ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ
প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ-সিংহ
৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
অমর স্মৃতি উদ্দেশে

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত

মূল্য দেড় টাকা

আর্ট প্রিণ্টার্স
১৪, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে
অতুলকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

প্রায় দুবছর আগে আমি প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন নামক কোনও নূতন লেখকের 'স্বর্ণমান' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ে চমৎকৃত হয়ে যাই। এবং এই অপরিচিত লেখকের প্রবন্ধ সম্বন্ধে উদয়নে নিম্নোদ্ধৃত প্যারাগ্রাফটি লিখি।

"Gold Standard ইকনমিকসের একটি জটিল সমস্যা। সে যাই হোক, Gold Standard এর পক্ষে কি বলবার আছে শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন অতি সহজ ভাষায় অতি বিশদ ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরিভাষার সাহায্য তাঁকে এক রকম নিতেই হয় নি।

"পরিভাষার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তার মহাদোষ হচ্ছে এই যে অনেক শাস্ত্রী ঐ পরিভাষাকেই শাস্ত্র মনে করেন। তখন এই শাস্ত্রের পণ্ডিতে পণ্ডিতে বোঝাপড়া হতে পারে কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।" (উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪০)

এরকম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গায়ে পড়ে স্তুতিবাদ করবার কারণ কি? কারণ এই যে, আমি ইতিপূর্ব্বেই লিখেছিলুম যে, "এ যুগের নব পলিটিকাল সমস্যা একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় সবই বর্ণচোরা ইকনমিক্ সমস্যা।" উপরন্তু এ যুগের সর্ব্ব প্রধান সমস্যা হচ্ছে, বিশ্বমানবের জীবন মরণের সমস্যা—যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে গত ইউরোপীয় যুদ্ধ। এ সমস্যার কোন চূড়ান্ত মীমাংসা করা অবশ্য আমাদের পক্ষে অসাধ্য; তবুও এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। জীবন এ যুগে অনেকটা মনের অধীন।

জীবনে যখন কোন বড় সমস্যা উপস্থিত হয় তখন মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। অধিকাংশ লোকেই দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়। কিন্তু

দুশ্চিন্তা দুরবস্থার কোনও প্রতিকারের উপায় দর্শাতে পারে না। আমরা অসুস্থ হলেই ডাক্তারের দ্বারস্থ হই—তেমনি ধনের দুর্ভিক্ষ হলে ইকনমিক শাস্ত্রীদের দ্বারস্থ হওয়াই এ যুগে আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অন্ততঃ তাঁরা বলতে পারবেন যে বর্ত্তমান রোগটা সুসাধ্য কি দুঃসাধ্য অথবা অসাধ্য। অবশ্য কোন চিকিৎসকই মানুষকে অমর করতে পারেন না, তাহলেও উক্ত শাস্ত্রের দিন দিন উন্নতি হচ্ছে।

কোনও ইকনমিক শাস্ত্রীই এই বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হতে উদ্ধার পাবার অদ্যাপি কোনও পথ দেখাতে পারেন নি। তথাপি তাঁদের সে আলোচনার যথেষ্ট মূল্য আছে। কারণ তাঁরা এ দুরবস্থার কতকগুলি কারণ আবিষ্কার করেছেন। আমরা যার কারণ জানি আমাদের বিশ্বাস সে কারণ দূরীভূত করবার শক্তিও আমাদের আছে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলের কিঞ্চিৎ জ্ঞান। কোনও চিকিৎসক কাউকেও রোগমুক্ত করতে পারেন না, যদি রোগীর দেহ ও মন সে মুক্তির অনুকূল না হয়। এর থেকে অনুমান করছি যে এ ক্ষেত্রেও লৌকিক চিন্তাই ইকনমিক শাস্ত্রের সহায়।

আমি অবশ্য ইকনমিক শাস্ত্রীদের হয়ে এ দাবী করছি নে, যে তাঁরাই সমাজের আর্থিক বিষয়ের সকল গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন। ইকনমিক্‌স শাস্ত্রের কথা অবশ্য বেদবাক্য নয়। তথাপি এ বিষয়ে তাঁরা কিছু জানেন—অপর পক্ষে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কোন সুফল নেই, কারণ মানসিক অন্ধকারের মধ্যে আমরা হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি। আমাদের অবস্থাও হয়েছে তাই।

আমি পূর্ব্বে একবার লিখি যে—“ইকনমিকসের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কেন না সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয়ে কিছু জানবার আমাদের কৌতূহল পর্য্যন্ত নেই।” তারপর আমি লিখি :—

“ইকনমিকস সম্বন্ধে আমাদের এ অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্যের অনেক কারণ আছে। তার ভিতর একটি স্পষ্ট কারণ এই যে, বঙ্গ সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত ইকনমিকসের স্থান নেই। ইকনমিক্স শাস্ত্রের যদি বাঙালা ভাষায় প্রচার হত তাহ'লে এবিষয়ে কোনরূপ মত দিবার অধিকার আমাদের না জন্মালেও ইকনমিক্স শাস্ত্রীদের মতামত বোঝবার অধিকার আমরা লাভ করতুম।”

মনের কি অবস্থায় ও কি বিশ্বাস বশতঃ আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শ্রীযুক্তঅনাথগোপাল সেনের উক্ত প্রবন্ধের গুণগান করি, তাই বোঝাবার জন্য আমি আমার পূর্ব্ব লিখিত প্রবন্ধ থেকে আমার মতামত উদ্ধৃত করছি।

আমি ইকনমিকসের অধ্যাপকও নই, ছাত্রও নই—সুতরাং আমার বিদ্যা জাহির করবার জন্য উক্ত প্রশংসা-পত্র লিখিনি। যে লেখা পড়ে মন খুসী হয়, সে লেখার তারিফ করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। তা' ছাড়া আমার উদ্দেশ্য ছিল,—লেখককে উৎসাহ দেওয়া, এবং শ্রীযুক্ত অনাথগোপল সেনের আলোচনার প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। পাঠক সমাজ যে এ শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন, তার প্রধান কারণ যে বাঙালা ভাষায় এ শাস্ত্রের সর্ব্বলোকবোধ্য আলোচনা হয় না। আমরা কেউ আর এ বিষয়ে স্বেচ্ছায় অজ্ঞ থাকতে চাইনে। আমাদের মনের খোরাক এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা যোগান না বলেই এ বিষয়ে আমাদের মাথা খালি রয়েছে।

আমার প্রথম উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে, তার প্রমাণ শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন পরপর আরও অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর লেখার যে গুণে আমি মুগ্ধ হই সে গুণ এই পরবর্ত্তী লেখাগুলিতেও আছে। তাঁর ভাষা সরল, আর বক্তব্য কথা তিনি গুছিয়ে বলতে পারেন। নিজের জ্ঞানকে একটি পরিচ্ছিন্ন রূপ দেওয়া

অতি কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ যে জ্ঞান—অসংখ্য facts-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এই সকল facts স্থূল দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী—অন্ততঃ এক পর্য্যায়ভুক্ত নয়। এই পুস্তকে "ভারতে মুদ্রানীতি" নামক প্রবন্ধ পড়ে দেখবেন যে তার ভিতর লেখক কি পরিশ্রম ও কি অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রবন্ধটি আমাদের ঘরের কথার আলোচনা; আমাদের জাতীয় লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ। সুতরাং এ দেশের মুদ্রার হালচাল সম্বন্ধে আমাদের কতকটা জ্ঞান থাকা উচিত।

অবশ্য—শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলেছেন, তা অবশ্য নয়। কেন না ইউরোপের কোন ইকনমিষ্টই অর্থের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নৈসর্গিক নিয়ম আবিষ্কার করেন নি। তার কারণ, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যের উপরই অনেকটা নির্ভর করে। তাই আমরা মনগড়া বিধি নিষেধ সব গড়ে তুলি। আর মানুষের মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইকনমিক শাস্ত্রও বদলে যায়। Bolshevic ইকনমিক্স কি ইউরোপের সনাতন ইকনমিক্স? এ বিষয়েও লেখক এ পুস্তকে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন।

আমি আশা করি, শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল সেনের "টাকার কথা" সমাজে বহুল প্রচার হবে। আমাদের মধ্যে যাঁরা পলিটিক্স সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাঁরা এ পুস্তক পাঠে তাঁদের চিন্তার পরিধি বাড়িয়ে নিতে পারবেন, আর যাঁদের কাছে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মতামতের কিছু মূল্য আছে তাঁদের বলি, যে এ পুস্তক সাহিত্য-পর্য্যায়ভুক্ত, ইকনমিক্সের নিরস Text book নয়।

বালিগঞ্জ, কলিকাতা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪২

লেখকের নিবেদন।

এই প্রবন্ধগুলি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইলে পর অনেকেরই ভালো লাগিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উদয়নের একাধিক সংখ্যায় আমার এই লেখাগুলির সুখ্যাতি করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার ন্যায় "সাহিত্যের ওস্তাদ জহুরী" ও বিচক্ষণ সমালোচকের এই প্রশংসা আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহদান করিয়াছিল। তাই এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময়েও তাঁহারই দেওয়া ভূমিকার টিকা ললাটে লইয়া বাহির হইল।

এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, অধুনা লুপ্ত "অভ্যুদয়" পত্রে, পরবর্ত্তী চারিটি প্রবন্ধ "প্রবাসী"তে এবং শেষ প্রবন্ধ দুইটি "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা ভাষায় অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার কারণ আমার প্রথম প্রবন্ধ হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, এই প্রবন্ধগুলি ধনবিজ্ঞানের কতগুলি কঠিন সূত্রের ইংরাজি-বাংলায় লিখিত নিরস পণ্ডিতী ব্যাখ্যা নহে। বিষয়গুলি চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যাগুলির স্বরূপ সহজ বাংলায় অনেকটা গল্পের (narrationএর) মত করিয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। তারপর সেগুলিকে অর্থশাস্ত্রের সূত্র দ্বারা বিচার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পথের ইঙ্গিত

দিবার চেষ্টা করিয়াছি। সমস্যার স্বরূপ, শাস্ত্রের বিধান ও মুক্তির পথ সম্বন্ধে পাঠকের সম্মুখে যাহাতে যুগপৎ একটি সহজ সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়া ওঠে এবং তিনি নিজেও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার মত আন্তরিকতা লাভ করিতে পারেন, যথাসাধ্য সেরূপ প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর সফল হইয়াছি তাহা সুধী পাঠকগণের বিচার্য্য। যাহা হোক, অর্থনীতি আলোচনা সম্পর্কে এই লেখাগুলি যদি সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের মনে কিঞ্চিন্মাত্রও উৎসাহ দান করে, এবং বাংলা ভাষায় ভবিষ্যৎ আলোচনার পথ সুগম করিতে সহায়তা করে, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

৩০২, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা।
রাখি পূর্ণিমা ১৩৪২

বিনীত—
শ্রীঅনাথ গোপাল সেন

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের নিবেদন

বইখানি সম্বন্ধে অনেক গুণীজনের অযাচিত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটিলেও, বাঙ্গালার সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় যে এতটা সমাদরের সহিত ইহাকে গ্রহণ করিবেন তাহা আমার কল্পনার অতীত ছিল। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল মধ্যে প্রথম সংস্করণের বইগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় বুঝিতে পারিতেছি, বাঙ্গালীর মনে আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের এই নবজাগ্রত ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া মাতৃভাষায় এই জাতীয় প্রবন্ধ লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম তাহা সার্থক হইয়াছে। আমাদের ভাষা-জননী ধন-বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় শীঘ্রই সমাদরের আসন করিয়া লইতে পারিবেন তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে।

বর্ত্তমান সংস্করণে পাঁচটি নূতন পরিচ্ছেদ সংযোগ করা হইল। তন্মধ্যে আধুনিক ও ভারতীয় ব্যাঙ্কিঙের আলোচনাই বেশীর ভাগ। পূর্ব্বের মুদ্রা ও বিনিময় (Currency and Exchange) সংক্রান্ত আলোচনার সহিত, এক্ষণে ব্যাঙ্কিং তত্ত্ব সংযুক্ত হওয়ায় সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের পক্ষেও আর্থিক জগতের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল সমস্যাগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা হয়ত কঠিন হইবে না। এতটুকু বইয়ে এরূপ জটিল, বিরাট ও সদাপরিবর্ত্তনশীল সমস্যাগুলির বিশেষজ্ঞজনোচিত বা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে, অবশ্য এরূপ দাবী আমি করিতেছি না।

নূতন প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই “প্রবাসী”তে, একটি “বঙ্গশ্রী”তে ও একটি “সংহতি”তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশিষ্টে অর্থশাস্ত্র সম্পর্কিত

অনেকগুলি ইংরাজী শব্দের পরিভাষাও দেওয়া হইয়াছে। ইহার সঙ্কলনে "অর্থ ও রাষ্ট্র" পত্রের ছাত্রবন্ধুগণের নিকট আমি অনেকাংশে ঋণী। পরিভাষার মধ্যে অনেক দোষ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে; অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গত প্রতিশব্দ জোটে নাই। তাহার জন্য সম্ভবতঃ লজ্জিত হইবার তেমন কারণ নাই; যেহেতু ভাষাজননীর মুখে এই নূতন কথাগুলি সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠিবার জন্য আরও খানিকটা সময়ের দরকার।

এই পুস্তক সম্পর্কে আমার সকলের চাইতে বড় ঋণ এখনও স্বীকার করা হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য কর্ণধার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে যেরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে উৎসাহ দান করিয়াছেন তাহা তাঁহার পুণ্যশ্লোক, প্রথিতযশা পিতৃদেবেই একমাত্র সম্ভব ছিল বলিয়া জানিতাম। আমি বিস্মিত হৃদয়ে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তকখানি আকারে প্রায় দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার মূল্য মাত্র ।০ আনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

৩০২, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৪৪

বিনীত—
শ্রীঅনাথগোপাল সেন

সূচিপত্র

১। রাজনীতি বনাম অর্থনীতি . ১—৮

২। স্বর্ণমান . ৯—২৩

৩। ভারতে মুদ্রানীতি .. ২৪—৪৭

৪। আমাদের রেশিও সমস্যা .. ৪৮—৬২

৫। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট .. ৬৩—৮৭

৬। দেশীয় শিল্পের অন্তরায় .. ৮৮—৯৫

৭। যে দেশে টাকা নাই ৯৯—১১৯

৮। অর্থ ও ঐশ্বর্য্য .. ১২০—১৩৬

৯। আধুনিক ব্যাঙ্কিং ... ১৩৭—১৫২

১০। আধুনিক ব্যাঙ্কিং (২) .. ১৫৩—১৬৬

১১। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ... ১৬৭—১৭৯

১২। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং (২) ... ১৮০—১৯৯

১৩। পরিভাষা ... ২০০—

রাজনীতি বনাম অর্থনীতি

আমরা রাজনীতি ব্যাপারে সহজেই তাতিয়া ও মাতিয়া উঠিতে শিখিয়াছি ; কিন্তু ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি ব্যাপারে আমাদের ধারণা অতি অস্পষ্ট। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা যদিও আজ ঠেকিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তথাপি তৎসম্বন্ধে আমাদের অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অভাব। আর জাতীয় বা আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাই আমরা আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অথচ রাজনীতি বা পলিটিক্স্ লইয়া এত যে রেষারেষি, দ্বন্দ্ব তাহার মূলে রহিয়াছে ব্যবসা, বাণিজ্য ও অর্থনীতি। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাক। পলিটিক্স্ বলিতে আমরা মোটামুটি বুঝি, বিভিন্ন দেশের রাজ্য-শাসন-প্রণালী ও তাহাদের অন্তর্নিহিত মূলনীতি এবং পরস্পরের বিরোধী স্বার্থের সামঞ্জস্য-সূচক সূত্রগুলি। এই নীতি ও সূত্রগুলির অন্তর্নিহিত প্রেরণা রহিয়াছে দেশাত্মবোধে ও নিজ নিজ জাতীয় কল্যাণ কামনায়। কিন্তু ইহাদের চরিতার্থতা রহিয়াছে দেশের অর্থোন্নতি ও ধনসম্পদ সমৃদ্ধিতে। অবশ্য পলিটিক্সের ইহাই চরম সার্থকতা নহে। মানুষের দৈহিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উৎকর্ষসাধন এবং সকল ক্ষেত্রে তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশই ইহার চরম লক্ষ্য। কিন্তু সত্যযুগের (golden age এর) ব্যবস্থা যেরূপই থাকুক না কেন এবং অর্থকে যতই অনর্থের মূল বলিয়া ভাবি না কেন, বর্ত্তমান কালে স্বর্ণ ও রৌপ্য চক্রকেই সকল উন্নতির মূল ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং উহারই মধ্যে সকল সিদ্ধির মাপকাঠি

রহিয়াছে। তাহা হইলে এক কথায় দাঁড়াইতেছে এই যে, দেশের পলিটিক্স্ বা রাজনীতি দেশের আর্থিক উন্নতি চেষ্টারই নামান্তর মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা শিক্ষিত বাঙ্গালী বা ভারতবাসী দেশাত্মবোধের প্রেরণা লাভ করিয়া পলিটিক্সে মাতিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য (implications) বা উদ্দেশ্য (goal) আজও আমাদের দৃষ্টির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে—উহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা বা হৃদয়ঙ্গম করা ত দূরের কথা। আত্মকর্ত্তৃত্ব, স্বরাজ, স্বাধীনতা আমাদের চাই। কেন চাই?—কারণ উন্নতিশীল সকল জাতিরই ইহা আছে, ইহা না হইলে আমাদের উন্নতির কোন আশা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহার অভাব বর্ত্তমান যুগে আমাদের শিক্ষিত আত্মাভিমানে ঘা দেয়। এই পর্য্যন্তই আমাদের দাবীর জোর। কিন্তু কেন আমাদের উন্নতি হইতেছে না, কোন দিক দিয়া কি ভাবে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া আছে, স্বাধীনতা পাইলে অসংখ্য সমস্যাগুলির মীমাংসা কি ভাবে, কোন পথে করিব, এই সব বিষয়ে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের কোন ধারণা নাই। সমস্যাগুলির প্রকৃতিই আমরা ভাল করিয়া জানি না; তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিব কি প্রকারে? টাকার দর ২।১ পেনি নড়চড় করিয়া দিলে দেশের কোটি টাকা ক'দিনে বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহা আমাদের মধ্যে কজনা জানেন?

য়ুরোপ ও আমেরিকা উন্নতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করিয়াও কালের গতির বর্ত্তমান পরিণতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া চোখে অন্ধকার দেখিতেছে, নিজ নিজ দেশ ও জাতিকে বাঁচাইবার পথ পাইতেছে না। আর আমরা—রাজনীতি অর্থনীতির এত বড় প্রলয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ের মধ্যে বাস করিয়াও শক্তিশালী জাতিসমূহের আত্মরক্ষার বিপুল প্রচেষ্টার পরিচয়টুকু পর্য্যন্ত রাখি না,

নিখিল মানবের স্বার্থ-সামঞ্জস্য ও ভাগবাটোয়ারার দরবারের সংবাদ রাখার প্রয়োজন বোধ করি না। স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিলেই আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিব কি করিয়া? কারণ "স্বাধীনতা" জিনিষটা আপনা হইতে মুহূর্ত্তে সকল অকল্যাণ অপনোদন করিতে পারে না। এই জিনিষটার এমন কোন সম্মোহন শক্তি নাই। দেশের প্রতিভা ও যোগ্যতা স্বাধীনতাকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারিলেই তবে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও অভাব আস্তে আস্তে ঘুচিবে। স্বাধীনতাকে ব্যবহার করা যে কত কঠিন য়ুরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান অবস্থা-সঙ্কট দেখিয়া আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত। অথচ দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের মধ্যে নিরানব্বই জন শিক্ষিত gold standard বলিতে কি বুঝায়, stabilisation of exchange কাহাকে বলে, tariff warটা কি, Ottawa agreement কাহাদের মধ্যে কেন হইয়াছিল জানেন না। অথচ সংবাদপত্র পাঠের সময় শব্দগুলি সর্ব্বদাই হেঁয়ালির মত তাহাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাঁহারা এগুলিকে এড়াইয়া চলেন। সেদিন ভারতীয় পরিষদে Anti-dumping Bill পাশ হইয়া গেল। ইহা লইয়া জাপানের সহিত ইংলণ্ডের একটা আন্তর্জ্জাতিক মনোমালিন্য সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহুকালের ব্যবসাসর্ত্ত রদ হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে ভারতের বয়নশিল্পের উন্নতি হইবে, কি লেঙ্কাশায়ারের সুবিধা হইবে তাহা লইয়া মতদ্বৈধ হইয়াছে, আলোচনাও চলিতেছে। এই নূতন আইনের প্রতিক্রিয়া অন্য জাতির উপর কার্য্য করিতে সুরু করিয়াছে। মোটের উপর এই নিয়া ব্যবসা ও অর্থজগতে বেশ একটা আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছে—কিন্তু যাহাদের ঘরের মধ্যে এই ব্যাপার তাহাদের কয়জন এটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন?

"হাওয়া গাড়ী" পেট্রলে চলে এই তথ্যটুকু আমরা সহরবাসীরা জানি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ পয়সা দিয়া পেট্রল কিনিয়া হাওয়া গাড়ী হাঁকাইয়াও থাকি। অজ্ঞ গ্রামবাসীদের অবস্থা মনে করিয়া তখন আমাদের অনেকের মনে আনন্দ ও গর্ব্বের সঞ্চারও হয়ত হয়। কিন্তু এই তরল পদার্থটির শক্তি যে কি ব্যাপক, ইহা নিয়া বড় বড় শক্তি সমূহের মধ্যে কত বড় অগ্নি দাহের সম্ভাবনা সর্ব্বদা বিদ্যমান, ইহার উপর কর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য রেষারেষির অন্ত নাই, ইহার ফলে কত নিরীহ দেশের প্রাণান্ত হইতেছে—এই সব খবর শিক্ষাভিমানী কয়জন সহরবাসী আমরা রাখি? কখনো ৸৶০ আনা, কখনো ১৷৴১০ দরে পেট্রল কিনি—"কেন" প্রশ্নের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

League of nations এর উদ্দেশ্য কি, ইহার সহিত ভারতের কি সম্পর্ক, Kellog pact দ্বারা কি সাধিত হইয়াছে, বড় বড় ধুরন্ধরগণ এতগুলি disarmament conference, world economic conference বসাইয়া মানব জাতির ভাগ্য কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন—তাহার খবর আমরা কয়জন শিক্ষিত রাখি? ভারতের কি ইহাতে কিছুই আসে যায় না? বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রতিপক্ষকে মাত করিবার জন্য এই যে দাবাখেলা চলিয়াছে আমরা কি তাহাতে সুধু unconscious pawn হইয়াই থাকিয়া যাইব? এ সব বৃহৎ ব্যাপারের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, দেশের ক্ষুদ্র ব্যাপার যাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে আমাদের ভালমন্দ গুরুতররূপে নির্ভর করে এমন একটি দৃষ্টান্ত হইতেও আমরা বুঝিতে পারিব আমরা নিজেদের মঙ্গল সম্বন্ধে কিরূপ উদাসীন হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছি।

বঙ্গদেশে কিছু দিনের মধ্যে অনেকগুলি লোন আফিস বা ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশেষভাবে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের সহর ও বন্দর ইহারা

ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই সব ব্যাঙ্কে বাঙ্গালীর প্রায় ৭।৮ কোটি টাকা খাটিত এবং এই ব্যাঙ্কগুলি কৃষক ও ভূম্যধিকারীর মধ্যেই দাদনের কাজ করিত। এক হিসাবে Land Mortgage Bankএর উদ্দেশ্যই ইহারা পূরণ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পাট ও খাদ্য শস্যের মূল্য ১৯৩০ সালের পর হঠাৎ অত্যধিক হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় অধিকাংশ ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়াছে। ফলে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে এমন একটি গুরুতর আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা একেবারে অভাবনীয়। এক কথায় এই ব্যাঙ্কগুলির দরজা বন্ধ করার ফলে, মফঃস্বলের সচ্ছল ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রায় যাবতীয় সঞ্চয় হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের—প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাইবার স্থানও সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইয়াছে। এমন একটা সময়ে আমাদের এই সঞ্চিত অর্থ হারাইয়াছি, যখন বর্ত্তমান রোজগার আমাদের সঙ্কটাপন্ন এবং সঞ্চিত তহবিলের ভরসাই প্রধান সম্বল হইবার কথা। এই কঠিন অবস্থা বিপর্য্যয়ের প্রতি দেশের নেতৃবৃন্দের ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি “অমৃত বাজার পত্রিকা”য় একটি পত্র প্রেরণ করি—এবং জনৈক বন্ধুর দ্বারাও ঐ সম্বন্ধে ঐ সংবাদপত্রেই আরো একটি পত্র প্রকাশ করি। এই সমস্যাকে মূল ভিত্তি করিয়া অমৃত বাজার পত্রিকা তাহার সম্পাদকীয় স্তম্ভে একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সব লোন আফিসের কর্ম্মবীরগণের অনেকেই শিক্ষিত উকিল, মোক্তার ও নেতৃস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও এই আলোচনায় যোগদান করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। দেশের অপর কাহাকেও এই আলোচনা করিতে দেখা গেল না। অথচ সেই সময়েই “নারী অত্যাচারী পুরুষকে অধিক ভালবাসে কিনা” এই রুচিকর Sex-psychology লইয়া আমাদের অনেকেই অমৃত বাজার পত্রিকার পত্রস্তম্ভে মাতিয়া উঠিলেন!

এবং তৎপরেই গোঁফবিহীন ও গোঁফবিশিষ্ট এই দুই জাতীয় পুরুষের মধ্যে কে নারীজাতির অধিকতর মনোনয়ন করিতে সক্ষম তাহার আলোচনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। গোঁফকে শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া লেখনী দ্বারা কতটা রমণী-মন জয় করা যায় এক্ষণে সম্ভবতঃ তাহার প্রতিযোগিতায় আরো কিছুদিন কাটিবে। রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং সম্পদারূঢ় হইয়াও আজ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের চোখের নিদ্রা ঘুচিয়াছে। আর আমরা সর্ব্বহারা হইয়াও নারী মনস্তত্ত্বে গোঁফ ও গোঁয়াড়ের স্থান এবং ১৯৩৬ সালের মিস বেঙ্গল লইয়া বিব্রত।

পাশ্চাত্য দেশ জানে কারণ ছাড়া কার্য্য ঘটে না। আমরা শিখিয়া রাখিয়াছি, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। উহাদের মধ্যে অকল্যাণ আসিলে তাহারা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতিকার না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হয় না। আমাদের দেশের আপামর সাধারণের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, শিক্ষিতেরাও নসিবের স্কন্ধে সকল অপরাধ চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

জনৈক আমেরিকান লেখক চিনাদের জনমত আলোচনা সম্পর্কে সম্প্রতি লিখিয়াছেন, "When the price of grain drops, the American farmer has little difficulty in persuading himself that sinister and immoral forces have caused his misfortune and that Governmental measures for redress are in order. The Chinese husband-man feels that a low cash return on his rice-crop is a part of his destiny, confirmed by centuries of experience and is to be borne with silent stoicism." আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীই কি এই মনোবৃত্তি

ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিয়াছি কিম্বা বাহ্যতঃ সেইরূপ প্রমাণ দিতেছি?

কথা হইতে পারে, স্বাধীনতার জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি। স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই সব দোষ, সব ত্রুটি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। জিজ্ঞাসা করি, সব দোষ কি স্বাধীনতারূপ সোণার কাঠির স্পর্শমাত্রেই দুদিনের ভিতর গুণে পরিণত হইবে? তারপর প্রশ্ন এই, যোগ্যতা না আসিলে স্বাধীনতাই বা পাইব কি প্রকারে? তৃতীয়তঃ, আমরা এমন কোন যোগ্যতার কথা এখানে আলোচনা করিতেছি না যাহা দেশ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত অর্জ্জন করা যায় না কিম্বা চেষ্টার সূচনা করা যাইতে পারে না। দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যুবকগণ বাহির হইতেছেন। তাহাদের পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের দরজা উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে। এবং আহৃত জ্ঞান আংশিক প্রয়োগের ক্ষেত্রও যথেষ্ট রহিয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গালীই সকল প্রদেশের পশ্চাতে। উচ্চ শ্রেণীর কবি, সাহিত্যিক, আর্টিষ্ট, বৈজ্ঞানিক, বাগ্মী, ধর্ম্মগুরু ও সমাজসংস্কারকের জন্ম এই বাংলার মাটিতে যে পরিমাণ হইয়াছে তাহা নিয়া আমাদের শ্লাঘা করিবার আছে। কিন্তু ধুরন্ধর ব্যবসায়ী (business magnate) বা বিশেষজ্ঞ (financial expert) বলিতে যাহা বোঝায় সে রকম ব্যক্তি ২।৪টি ও খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। বড় ব্যবসায়ী হিসাবে, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্যার রাজেন্দ্রের নামই করিতে হয়।* অর্থ-নৈতিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে

---

* বাংলার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনিও সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত বণিকসম্প্রদায়ের পাশে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী যিনি সম্মানের আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন।

বাংলার ঘরে শূন্য দিলেই চলে। কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় নিখিল-ভারত-ব্যবসা-সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী সব বিষয়ে বক্তৃতা করিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান জগতের সারতত্ত্ব ব্যবসা ও অর্থনীতির কথা উঠিলেই সরিয়া দাঁড়ায়। অথচ বিষয়টাকে যতদূর দুরূহ ও রসহীন বলিয়া আমরা মনে করি প্রকৃতপক্ষে উহা মোটেই সেরূপ নয়। যদি তাহাই হইত তবে অবাঙ্গালীরা ব্যবসা বাণিজ্যে এত উন্নতি করিতে পারিত না। তাহাদের অনেকে ইংরাজী অনভিজ্ঞ হইয়াও পৃথিবীর টাকার বাজারের সমস্ত সংবাদ নখাগ্রে রাখিতেছেন এবং আমদানী রপ্তানী ব্যবসা ও share speculation করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন। প্রতি বৎসর এতগুলি প্রথম শ্রেণীর এম-এ, বি-এ, এতকাল ধরিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছেন; কিন্তু নিখিল ভারত ব্যবসা-সঙ্ঘের প্রথম বাঙ্গালী সভাপতি তাহাদের কেহ হন নাই। যিনি হইয়াছেন তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী নাই। অপরিসীম উৎসাহ, অসাধারণ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত চেষ্টা তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়াছে। চাই শুধু বর্ত্তমান জগতে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে এই জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ও তাহার অনুকূলে তদনুরূপ চেষ্টা।

স্বর্ণমান

বর্ত্তমান সময়ে আমরা সকলেই অর্থসঙ্কটের ফল কম-বেশী ভোগ করিতেছি। এমন কি ঐশ্বর্য্যশালী ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থাও কাহিল। সুখ ও সম্পদের একটানা উর্দ্ধগতির পথে হঠাৎ শনির দৃষ্টি উহাদের উপরও পড়িয়াছে। উর্দ্ধরেখা নীচের দিকে নামিতে সুরু করিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এই ছিল তাহাদের মূলমন্ত্র। এদিকে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিতেছে, বিশ্বের হাটে মূল্য যাহা মিলে তাহাতে খরচ পোষায় না। আবার সকল দেশই নিজের পণ্য অন্য দেশে পাঠাইয়া নিজের কোলে সমস্ত ঝোল টানিতে চান। কেহই পরের দ্রব্য পারতপক্ষে ক্রয় করিবেন না; তাহার জন্য ফন্দিফিকিরের অন্ত নাই। ফলে বাণিজ্য হইয়াছে অচল—কলকারখানার মজুর, কারিগর ও কৃষক বসিয়াছে পথে। প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য্যের মাঝেও বেকারসমস্যা তাহার বিরাট ও বিকট মূর্ত্তি লইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থনীতিবিশারদ না হইয়াও আমরা এই সহজ সত্যটুকু চোখে দেখিতেছি ও বুঝিতেছি যে, সকল দেশের কাঁচা ও তৈয়ারী মালের চাহিদা ও দর কমিয়া যাওয়াতেই এই সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের সম্পদ যাহারা হাতে-নাতে সৃষ্টি করে (producers of wealth) তাহাদের হাত যখন শূন্য হইতে সুরু হইল, সঙ্গে সঙ্গে আর সকল শ্রেণীর অবস্থাও হইল কাহিল; কারণ আর সকলে তাহাদের ধনে পোদ্দারী করেন মাত্র। এই পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি। কিন্তু জিনিষের চাহিদা ও

দরের হঠাৎ এরূপ নিম্নগতি হইল কেন; আবার কি করিলে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে; আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতির সহিত এ সমস্যার সম্বন্ধ কোথায়; স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলেই দেশ-বিশেষের বাণিজ্যের উন্নতি কি পরিমাণ হইতে পারে; বিভিন্ন দেশের অর্থের বিনিময়ের হার অ-স্থির ও অনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কি প্রকারে ব্যবসার ক্ষতি হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর অব্যাহত বাণিজ্যনীতির পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান কালের রক্ষণশীল নীতি কি ভাবে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে; পৃথিবীব্যাপী ঋণের গুরুভার, বিশেষতঃ সমর-ঋণের নিষ্ঠুর চাপ, পৃথিবীর কতখানি শ্বাসরোধ করিতেছে—এ সব জটিল প্রশ্ন যখন ওঠে তখন তৎসম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত বাঙালীদের ভাবিবার বা বলিবার কিছু থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে আমরা যদি টিকিতে চাই তাহা হইলে এই সব ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। চারিদিকে মুক্তিপথের সন্ধান চলিয়াছে। বৈঠক ও পরামর্শের শেষ নাই। আমাদের অনেকের মনেও এক্ষণে এ-সব বিষয়ে কিছু জানিবার আগ্রহ হইয়াছে। তাই আজ অর্থনীতির গোড়ার কথা 'স্বর্ণমান' সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করা যাক।

কর্ম্মবিভাগ, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের সহজ বিনিময়ের উপায় ও স্বোপার্জ্জিত ধনে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার—এই কয়টিকে মূল ভিত্তি করিয়া আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত। কোন সমাজ যখন আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বল্প অভাব লইয়া বসবাস করে কেবল তখনই 'বার্টার' অর্থাৎ দ্রব্যবিনিময়ে বেচাকেনার কাজ চলিতে পারে। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ যখন নগণ্য ছিল এবং নিজের দেশেই ভিন্ন জনপদের সহিত

আমাদের বেচাকেনার সম্পর্ক অতি সামান্য ছিল, তখনই আমরা ধানের পরিবর্ত্তে দেশী জোলার গামছা, কামারের দা ও লাঙ্গলের ফাল কিনিতে পারিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান কালে ধান চাল দিয়া আমরা বিলাতী মোটর গাড়ী, এমন কি কাশ্মীরী শাল কিনিতে পারি কি? কাজেই যখন একই দেশের বিভিন্ন গ্রাম বা সহরে নহে, একেবারে বিভিন্ন দেশে অসংখ্য রকম পণ্য তৈরী হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহাদের মধ্যে অবারিত বিনিময় চলিতে লাগিল তখন আদিম যুগের 'বার্টার' পন্থায় আর কাজ চলিতে পারিল না। এইরূপ অসংখ্য পণ্য-বিনিময়ের হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য একটা মধ্যস্থ মাপকাঠি স্থির করিয়া লইতে হইল। আমরা যদি আজও সেই 'বার্টার' এর যুগেই থাকিতাম তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের এরূপ বিরাট ও দ্রুত প্রসার হইতে পারিত না। যে মধ্যস্থ মাপকাঠির কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম তাহারই নাম অর্থ (Money)। অর্থশাস্ত্রে অর্থকে ধন বা সম্পদের প্রতিভূ মাত্র বিবেচনা করা হয়। দেশের ধন বা সম্পদ বলিতে সেই দেশের অর্থকে বুঝায় না, সেই দেশের কাঁচা বা তৈরী মাল—বিশ্বের হাটে যাহার চাহিদা আছে—তাহাকেই বোঝায়। অর্থ বা টাকা কাগজের তৈরি নোটও হইতে পারে, তাহার ত নিজের কোন মূল্যই নাই। রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা হইলে তাহাদের মধ্যস্থিত ধাতুর যাহা বাজার দর ঐটুকুই দেশের সম্পদ হিসাবে তাহার কদর। পণ্যবিনিময়ের সুবিধার জন্য এই যে প্রতিনিধিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন নাম ও ভিন্ন মূল্য। ইংলণ্ডের মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টার্লিং নামে পরিচিত, আমেরিকার মুদ্রার নাম ডলার, ফ্রান্সের মুদ্রাকে ফ্র্যাঁ বলা হয়। তিনটি মুদ্রারই স্বর্ণের পরিমাণ জানা থাকায় তাহাদের বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা কঠিন হয় না। অবশ্য কোন

দেশের মুদ্রা বলিতে আমরা এক্ষণে শুধু সেই দেশের স্বর্ণমুদ্রাকেই বুঝিব না—ব্যাঙ্ক নোট, চেক, হুণ্ডি ইত্যাদিগকেও বুঝিব। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে ধাতব মুদ্রা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত হ্রাস পাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বাণিজ্যের অধিকাংশ লেন-দেন ব্যাঙ্ক নোট ও ব্যাঙ্ক চেক দ্বারাই চলিয়াছে; ধাতব মুদ্রার সহিত বাহ্যতঃ তাহার সম্পর্ক খুবই কম। কিন্তু ভিতরের ব্যাপার অন্যরূপ। আমরা তামা, নিকেল, রৌপ্য, কাগজের নোট বা চেক—যাহারই সাহায্যে পণ্য ক্রয় করি না কেন, এই সকলের পশ্চাতে পাউণ্ড, ডলার, ফ্রাঁ প্রভৃতি মুদ্রা যে ধাতুতে গঠিত সেই ধাতু সমপরিমাণে থাকা চাই। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাক। এক পাউণ্ড ছাপের নোট গ্রহণ করিয়া আমি আমার পণ্য বিক্রয় করিলেও তৎপরিবর্ত্তে আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এক পাউণ্ডের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য পাইতে অধিকারী। ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক পাউণ্ড নোটের পরিবর্ত্তে, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে ১২৩¼ গ্রেণ ওজনের সোনা পাওয়া যাইতে পারিত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দেশের মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্ণিয়ার সোনার খনি আবিষ্কারের সঙ্গে মুদ্রা ব্যাপারে রৌপ্যের স্থান স্বর্ণ অধিকার করিতে আরম্ভ করে। লড়াইয়ের সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সাল ও ১৯১৯ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে একটা মস্ত ওলটপালট হইয়া যায়। এবং অধিকাংশ দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯১৯ ও ১৯২৫ সালের মধ্যে প্রধান প্রধান দেশগুলির সমবেত চেষ্টায় আন্তর্জ্জাতিক স্বর্ণমান পুনরায় সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোন দেশের মুদ্রা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে আমরা কি বুঝিব? আমরা বুঝিব, (১) স্বর্ণ সেই দেশের 'লিগেল টেণ্ডার' অর্থাৎ সেই দেশে স্বর্ণের বিনিময়ে বেচাকেনা চলে; (২) আমরা সেই দেশের রাজকোষে সোনার থান দাখিল করিয়া তদ্বিনিময়ে তুল্যমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা পাইতে অধিকারী; (৩) জনসাধারণের অবাধ স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তানীর অধিকার আছে।

এই স্বর্ণমান হইতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হয় এক্ষণে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক দেশের মুদ্রা যদি একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণ দ্বারা গঠিত হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার (rate of exchange) ও সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। যদি এক ষ্টার্লিঙে ১২৩½ গ্রেণ, এক ডলারে ২৫ গ্রেণ, এবং এক ফ্র্যাঁতে প্রায় ৫ গ্রেণ খাঁটি সোনা থাকে তাহা হইলে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং, ৪·৮৬ ডলার ও ২৫ ফ্র্যাঁব সমান হইবে (কাছাকাছি হিসাব ধরা হইল)। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিনিময়ের হার যথাসম্ভব ঠিক রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ কেনাবেচার কাজ ধারে হওয়ায় ইহার প্রয়োজন আরও বেশী এবং স্বর্ণমান দ্বারা সেই প্রয়োজনই সাধিত হইয়া আসিতেছিল। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমেরিকা হইতে ইংরেজ ব্যবসায়ী তুলা খরিদ করিলে তাহাকে তাহার মূল্য ডলারে হিসাব করিয়া দিতে হইবে। যদি ডলার ও ষ্টার্লিঙের মধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট থাকে তবেই কত ষ্টার্লিং হইলে তাহার চলিবে তাহা বুঝিয়া লাভালাভ হিসাব করিয়া সে ব্যবসা করিতে পারে। এক ষ্টার্লিং = ৪·৮৬ ডলার হইলে (উভয় দেশ স্বর্ণমানে থাকা কালীন বিনিময়ের হার এইরূপ ছিল) ইংরেজ ব্যবসায়ীকে হাজার ডলার মূল্যের তুলার জন্য কত ষ্টার্লিং দিতে হইবে তাহার হিসাব

সে সহজেই করিতে পারে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের সহিত স্বর্ণের অভেদ্য সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল, প্রত্যেক পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের বিনিময়ে স্বর্ণ পাওয়া বন্ধ হইল, অমনি ষ্টার্লিঙের মূল্য হ্রাস পাইতে সুরু করিল। স্বর্ণ বা ডলারের সহিত তাহার বিনিময়ের হার কমিতে লাগিল ও অনির্দ্দিষ্ট হইল। যেখানে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং = ৪·৮৬ ডলার ছিল সেখানে বিনিময়ের হার অনির্দ্দিষ্ট হইয়া এক পাউণ্ড ষ্টার্লিঙের মূল্য ৩·৩০০ ডলার হইতে প্রায় ৪ ডলার পর্য্যন্ত অনবরত ওঠা নামা করিতে লাগিল। ফলে ইংরেজ ব্যবসায়ীকে হাজার ডলারের বিনিময়ে কেবলমাত্র যে অধিক ষ্টার্লিং দিতে হইল তাহা নহে, উপরন্তু কতটা অধিক দিতে হইবে তাহাও সে বিনিময়ের অনিশ্চয়তার দরুণ বুঝিতে পারিল না। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার ঠিক না থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং বাণিজ্য জুয়াখেলা ও ভাগ্যপরীক্ষায় পরিণত হয়।

স্বর্ণমান আর একটী বড় উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রত্যেক নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার সর্ত্ত থাকায় কোন গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক নোট ছাপাইয়া চালাইতে পারেন না। কারণ নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হয়। তদ্দরুণ অতিরিক্ত কাগজের মুদ্রা প্রচলিত হইয়া জিনিষের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কেনাবেচার জন্য যে পরিমাণ মাল দেশে আছে তদনুপাতে যদি মুদ্রার পরিমাণ বেশী (inflation of currency) হয়, তাহা হইলে যোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে জিনিষের মূল্য অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া যাইবে। ফলে সেই দেশের জিনিষ বিদেশে কম রপ্তানী হইবে এবং বিদেশী জিনিষের আমদানী

বাড়িবে। অথচ বিদেশীকে জিনিষের মূল্য কাগজে দেওয়া চলিবে না। ফলে দেশের সোনা বিদেশে চলিয়া যাইতে সুরু করিবে। স্বর্ণমান অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলনের প্রতিবন্ধকতা করিয়া এইরূপে তাহার কুফল নিবারণ করে। এই ত গেল সুবিধার দিক।

একটা অসুবিধার দিকও ইহার আছে। ইহার সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনিময়ের হার ঠিক থাকে সত্য কিন্তু কোন জিনিষের দর দেশ-বিশেষের যোগান ও চাহিদা, তৈরী খরচ, মুদ্রার পরিমাণ ইত্যাদি অবস্থার উপর ততটা নির্ভর করে না—পৃথিবীময় মোট স্বর্ণের পরিমাণ ও অন্যান্য অবস্থার উপর যতটা নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার ব্যবধান ঘুচিয়া যাওয়ায় কোন দেশের পণ্য আর এখন কেবল সেই দেশের পণ্য হিসাবেই গণ্য হইতে পারে না; বিশ্বের সকল হাটই তাহার খোঁজ রাখে এবং সেই কারণেই তাহার কদর দুনিয়ার হাটের অবাস্থর উপর নির্ভর করে। আমরা দেখিয়াছি বিশ্বের হাটে কেনা-বেচার মূল্য দেওয়া হয় স্বর্ণে। পণ্য বিনিময়ে যদি আমরা স্বর্ণ লইতে চাই তাহা হইলে পৃথিবীর পণ্যের দর পৃথিবীর স্বর্ণের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। তাই বিশ্বের হাটের দর তাহার নিজ নিয়মে যেমন নিয়ত ওঠা-নামা করিতে থাকে, বিভিন্ন দেশের দরকেও তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হয়। ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই যে, স্বর্ণমানের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীর সহিত ব্যবসাক্ষেত্রে আমাদের সংযোগ যেমন সহজ হইয়াছে, তেমনি আমাদের দেশের জিনিষের দর অর্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ (deflation and inflation) সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি আমাদের হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। যাহাদের জীবিকা একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর নির্ভর করে, তাঁহারা দরের এই নিয়ত পরিবর্ত্তন কিছুতেই পছন্দ করিতে পারেন

না—ভাগ্যান্বেষী দলের নিকট ইহা যতই লোভনীয় হউক না কেন।

পৃথিবীর বাজার দরের ওঠা-নামা প্রধানতঃ কি কারণে হয় এখানে তাহার একটু আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি বিশ্বের হাটে কেনাবেচা যে-ভাবেই হউক না কেন, কার্য্যতঃ ও প্রকৃত প্রস্তাবে সোনার সাহায্যেই ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে অর্থনীতির মূলসূত্র যোগান ও চাহিদার নিয়মানুসারে বিশ্বের স্বর্ণ তহবিলের কম-বেশীর সহিত জিনিষের দর নামিবে ও চড়িবে। সোনার পরিমাণ কমিয়া গেলে জিনিষ ক্রয়কালীন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সোনা কম দিতে হইবে, অর্থাৎ জিনিষের দাম কমিবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর স্বর্ণতহবিল বৃদ্ধি পাইলে জিনিষ কিনিতে অধিক সোনা দেওয়া সহজ হয় এবং জিনিষের দর বাড়িতে থাকে। সেই জন্যই দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফর্ণিয়ার স্বর্ণখনি আবিষ্কারের সঙ্গে পৃথিবীর বাজার-দর চড়িয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে-পরিমাণ পণ্যদ্রব্য হাটে আসিতেছে সেই পরিমাণে স্বর্ণ বৃদ্ধি পাইতেছে না। তদুপরি আমেরিকায় ও ফ্রান্সে প্রভূত স্বর্ণ অব্যবহৃত অবস্থায় আবদ্ধ আছে। চলতি সোনার এই ঘাটতি বাজার-দর পড়িয়া যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ।

ইংলণ্ড ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল কেন এবং এই পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহার লাভ ক্ষতি কি হইয়াছে এক্ষণে তাহা আলোচনা করা যাক। অর্থের (currencyর)বা দ্রব্যের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে না পারিলেই স্বর্ণমান পরিহার করা ভিন্ন উপায় থাকে না, মোটামুটি ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্বর্ণের প্রধান হাট ইংলণ্ডে স্বর্ণাভাব ঘটিল কি করিয়া তাহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এই

আলোচনা প্রসঙ্গে কি করিয়া প্রভূত স্বর্ণ আমেরিকায় ও ফ্রান্সে আসিয়া জমা হইল তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব। ইংরেজ জাতিকে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য, কাঁচা মাল ইত্যাদি বিদেশ হইতে অনেক পরিমাণে কিনিতে হয় বলিয়া তাহার রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী অধিক এবং বাণিজ্যের গতি (balance of trade) তাহার প্রতিকূল। ইহার অর্থ এই যে, বাণিজ্য করিয়া ইংলণ্ড বিদেশ হইতে যত টাকা পায় তদপেক্ষা বেশী টাকা তাহার বিদেশকে দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকার স্বর্ণ প্রতি বৎসর তাহার দেশ হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবার কথা। কিন্তু এই সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, বিদেশে ইংরেজের যে বিপুল মূলধন ব্যবসায়ে খাটিত তাহার সুদ ও লাভ এবং পণ্যবাহী নৌবহর (mercantile marine) হইতে তাহার আয় এত অধিক ছিল যে তদ্দরুণ বিদেশকে অতিরিক্ত আমদানীর জন্য কোন টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হওয়া দূরের কথা, উপরন্তু প্রতি বৎসর ইংরেজই বিদেশ হইতে বহু টাকা পাইবার হকদার ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের এই সব আয় অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে এবং আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ অন্তে তাহাকে দেনদার হইতে হয়। ইংলণ্ডে স্বর্ণাভাবের ইহা অন্যতম কারণ, যদিও প্রধান কারণ নহে।

প্রধান কারণ খুঁজিতে হইলে আমাদিগকে ইউরোপীয় তৎকালীন কতকগুলি অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। লড়াইয়ের পর হৃতসর্ব্বস্ব জার্ম্মাণীর উপর পর্ব্বত-প্রমাণ ঋণভার চাপাইয়া দেওয়া হইল। ব্যবসা-বাণিজ্য, পণ্যবাহী নৌবাহিনী যাহার সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার বিদেশ হইতে আনীত মুখের অন্নের মূল্যটুকু পর্য্যন্ত দিবার শক্তি ছিল না, সে কোথা হইতে এত টাকা দিবে? কিন্তু ইহারা

বিষম জেদী জাত, তাই মরণপণ করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কিন্তু তাহার জন্য বিপুল মূলধনের দরকার, মূলধন আসিবে কোথা হইতে? আমেরিকা ও ইংলণ্ড তাহাকে টাকা ধার দিতে রাজী হইল। ফলে জার্ম্মাণী অতি অল্প সময়ের ভিতর নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের আশ্চর্য্য রকম উন্নতিসাধন করিয়া ফেলিল। কিন্তু ধার-করা টাকার সুদ আছে এবং সুযোগ বুঝিয়া ইহারা সুদও খুব উচ্চ হারে ধরিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই বিরাট ঋণের বোঝা মাথায় করিয়া এত চেষ্টাতেও জার্ম্মাণী তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন বিশেষ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে ১৯২৮-২৯ সালে আমেরিকা নিজের আভ্যন্তরীণ কতকগুলি কারণে জার্ম্মাণীকে আর টাকা ধার দিতে রাজী হইল না। ফলে জার্ম্মাণীর অবস্থা হইল সঙ্গীন। জার্ম্মাণীর ধ্বংসে ফ্রান্সের প্রভাব ইউরোপে অপ্রতিহত হইয়া পড়িবে এবং হয়ত ইউরোপে একটা বিপ্লবের সৃষ্টিও হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া ইংলণ্ড নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না এবং জার্ম্মাণীকে ঋণ-দান ব্যাপারে আমেরিকার শূন্য স্থান অধিকার করিল। অবশ্য ইহার পিছনে রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত লাভের প্রত্যাশাও ছিল। ব্যবসায় মন্দা হেতু ইংরেজ ব্যাঙ্কারদের হাতে বহু টাকা জমিয়া যায়। আমেরিকা ও ফ্রান্সের ধনী সম্প্রদায়ের অনেক টাকাও এই-সব ব্যাঙ্কে সুদে খাটিত। ইংরেজ বাঙ্কাররা তিন টাকা সুদে ইহাদের টাকা গচ্ছিত রাখিয়া আট টাকা সুদে ঐ টাকা জার্ম্মাণীকে ধার দিতে লাগিলেন। কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসার অবস্থা নিম্নগামী হওয়ায় জার্ম্মাণী কিছুতেই আর তাল সামলাইতে পারিল না। তাহার অবস্থা যত বেশী সঙ্গীন হইতে লাগিল, নিজেদের পূর্ব্ব প্রদত্ত অর্থ বাঁচাইবার জন্য তাহাকে রক্ষা করা ইংরেজের তত

বেশী আবশ্যক হইয়া পড়িল। ফলে বাধ্য হইয়া আরও বেশী করিয়া টাকা ইংরেজ জার্ম্মাণীকে ধার দিতে লাগিল। এইরূপ ঋণদানের জন্য ইংরেজদের ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা আস্থাহীনতার দরুণও বটে, আবার নিজেদের দেশের অর্থসঙ্কট তখন গুরুতর হওয়ার দরুণও বটে, আমেরিকা ইংরেজদের ব্যাঙ্কে স্বল্প মেয়াদে গচ্ছিত টাকা ফেরত চাহিয়া বসিল। কিন্তু ইংরেজদের দেনদার জার্ম্মাণী, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ কেহই তাহাকে টাকা দিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া ইংরেজকে তাহার নিজ মজুত তহবিল হইতে আমেরিকায় স্বর্ণ পাঠাইতে হইল। এইরূপে এত স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইতে লাগিল যে, সত্বর এই স্বর্ণ-রপ্তানী বন্ধ করিতে না পারিলে ইংরেজের স্বর্ণ-তহবিল শূন্য হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া পড়িল। তখন আমেরিকা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এই স্বর্ণ-রপ্তানী বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমেরিকার মহাজনেরা ইংলণ্ড হইতে টাকা তুলিয়া লইতে ক্ষান্ত হইলেন না। ফলে আমেরিকা হইতে যে-টাকা ধার লওয়া হইল তাহাও শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া গেল। পুনরায় ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিলে আমেরিকা এমন কতকগুলি অপমানসূচক সর্ত্ত করিয়া লইলেন যাহার ফলে ইংরেজ মন্ত্রীবর্গের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া 'লেবার' গবর্ণমেণ্ট পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের সংমিশ্রণে ন্যাশন্যাল গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়। এই-সব গোলমালে ইংরেজের প্রতি আমেরিকা ও ফ্রান্সের আস্থা আরও কমিয়া যায়। মাহিনা কমানো লইয়া ইংরেজ নৌ-সেনানীর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সংবাদ ইতিমধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে এবং ফ্রান্স ও আমেরিকা উভয় দেশ তাহাদের প্রাপ্য টাকার জন্য অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন উপায়ান্তরহীন হইয়া ইংলণ্ডকে স্বর্ণমান

পরিহার করিতে হয়। এই সময়ে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের স্বর্ণ-তহবিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইংলণ্ডের অবস্থা কি পর্য্যন্ত কাহিল হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ১৯৩১ সালে আমেরিকার স্বর্ণ-তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪৬০০ মিলিয়ন ডলার; ফ্রান্সের ২৩০০ মিলিয়ন ডলার; ইংলণ্ডের ৬৫০ মিলিয়ন ডলার মাত্র।

স্বর্ণমান পরিহার করার ফলে বিদেশী মহাজনদের দেনা পরিশোধ করা ভিন্ন আর কাহাকেও সোনা দেওয়ার দায় হইতে ইংলণ্ড রক্ষা পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী করিবার অধিকারও আইন-দ্বারা রহিত করা হইল। স্বর্ণহীন হইয়া এক পাউণ্ড কাগজের নোটের মূল্য কমিয়া গেল এবং যেখানে এক পাউণ্ড ষ্টার্লিং ৪·৮৬ ডলারের সমান ছিল, সেখানে তাহার মূল্য ন্যূনকল্পে ৩·৩০০ ও উর্দ্ধকল্পে ৪ ডলার মাত্র দাঁড়াইল। এই ব্যাপারে জগৎ সমক্ষে ইংলণ্ডের সম্মানের খুবই লাঘব হইল বটে, কিন্তু স্বর্ণমান পরিহার করার ফল তাহার পক্ষে শাপে বর হইয়া দাঁড়াইল। ষ্টার্লিংএর মূল্য হ্রাস পাওয়ায় বিলাতি মালের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া গেল। কারণ ষ্টার্লিঙের বিনিময়ে ফ্রান্স, আমেরিকা বা অন্যান্য দেশের কম স্বর্ণ মুদ্রা দিবার প্রয়োজন হইল। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া বিদেশী জিনিষের আমদানী বন্ধ করিবার যে চেষ্টা করিতেছিল ইংরেজ তাহা এই ভাবে আংশিক ব্যর্থ করিয়া দিল। তাই ইংলণ্ড যখন সমর-ঋণের দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমেরিকার নিকট অনুরোধ জানাইল, তখন মহাজন পক্ষ হইতে এমন একটা সর্ত্তের কথা উঠিয়াছিল যে, ইংলণ্ড যদি স্বর্ণমান পুনঃ গ্রহণ করে তবেই তাহদের অনুরোধ সম্বন্ধে আমেরিকা বিবেচনা করিতে পারে। ইংলণ্ড এইরূপ সর্ত্তে অত্যন্ত আপত্তি করে। ফলে ওয়াশিংটন আলোচনায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও

মিঃ রুজভেল্টের মধ্যে কোনরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাই; অধিকন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে নিজ গৃহে আদর-আপ্যায়নে পরিতোষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকা স্বর্ণমান পরিহার ঘোষণা করিয়া ইংলণ্ডকে পাল্টা জবাব দিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া বিনিময় হারের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মন্দার বাজারে জিনিষের দর কমাইতে পারিয়া ইংলণ্ড কিছুটা সামলাইয়া লইতে পারিয়াছে। অবশ্য এ সুবিধা বেশী দিন থাকিবে না—যদি আমেরিকার ন্যায় ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশও স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। *

এক্ষণে পৃথিবীর বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে আমরা এইরূপ একটা ধারণা মোটামুটি করিতে পারি—পৃথিবীতে কাঁচা ও তৈরী মাল অতিরিক্ত পরিমাণে সৃষ্টি হইতেছে; অর্থের বা স্বর্ণের পরিমাণ ঐ মালের অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই; আন্তর্জ্জাতিক ঋণের চাপে ও অন্যান্য কারণে স্বর্ণের ভাগ প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী না হওয়ায় পৃথিবীর অর্থের বা সোনার বাজারে একটা অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হইয়া দেশের অর্থ যাহাতে বিদেশে চলিয়া না যায় তজ্জন্য বিদেশী মালের উপর অতিরিক্ত শুল্ক বসাইয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি করা হইতেছে; অবস্থার চাপে

---

* কার্য্যতঃ ফ্রান্স, ইটালী ও মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র কয়েকটী দেশ ব্যতীত অধিকাংশ দেশই ইংলণ্ডের সাথে সাথে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। স্বর্ণ-মান বজায় রাখিতে যাইয়া ফ্রান্স ও মধ্য ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশগুলির অবস্থা কাহিল হইয়া ওঠে। বিশেষতঃ ফ্রান্সে কোন গভর্ণমেণ্টই স্থায়ী হইতে না পারায় অবশেষে ১৯৩৬ সালে ফরাসীয় গভর্ণমেণ্ট ফ্র্যাঁ মুদ্রার স্বর্ণ-ওজন হ্রাস (*devaluation*) করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ঐ সঙ্গে ইটালী এবং মধ্য ইউরোপের বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও ফ্রান্সের পথ অনুসরণ করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে। ফলে ঐ সব দেশের সহিত বাণিজ্যিক আদান প্রদানে ভারতের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা আরো কঠিন হইয়াছে।

পড়িয়া কতগুলি দেশ স্বর্ণমান পরিহার করিতে বাধ্য হওয়ায় এবং তাহার ফলে তাহাদের মাল বিদেশে স্বল্প মূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্বর্ণমান পরিহারের অন্তর্নিহিত কারণ বিদূরিত করিয়া বিনিময়ের হার স্থির রাখিয়া মূল্যমানের (general price level-এর) উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান হইতে পারে ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু কি করিয়া তাহা সম্ভব এক্ষণে ইহাই প্রশ্ন বা সমস্যা। সকলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখিলে যেমন কোন জাতির সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষা হইতে পারে না, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিই যদি নিজ নিজ 'পাউণ্ড অব ফ্লেশ' দাবি করে, তাহা হইলে পরস্পর সংশ্লিষ্ট এই আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার মীমাংসা হওয়া সুদূরপরাহত। দেশসমূহের মনোবৃত্তি যদি বিশ্বাস ও সাহসের সহিত জাতীয়তার ও বিশ্বমানবতার সমন্বয় করিতে না পারে, তাহা হইলে মীমাংসা অসম্ভব এবং সম্মুখে বিপ্লব ও নূতন সৃষ্টি এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী।

স্বর্ণমান যতদিন থাকিবে ততদিন নোটের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিবার সর্ত্তও থাকিবে এবং আইন করিয়া স্বর্ণের অতিরিক্ত নোটের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; দুনিয়ার পণ্য বাড়িয়া চলিলেও দর চড়া রাখিবার জন্য ইচ্ছামত নোট প্রচলন করা যাইবে না। সেইজন্য প্রশ্ন উঠিয়াছে দুনিয়ার স্বর্ণ-তহবিল অনুযায়ী অর্থের প্রয়োজন নির্দ্ধারিত না করিয়া দুনিয়ার পণ্যের পরিমাণ অনুসারে অর্থ প্রচলন করা সম্ভব কি-না। তাহা হইলে অর্থের পরিমাণ বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্যও চড়িয়া যাইবে এবং সেই মূল্যের এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু তাহা করিতে হইলে দেশ-বিশেষের চেষ্টায় উহা সম্ভব হইতে পারে না। সকল জাতি মিলিয়া যদি একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে পারে এবং সেই ব্যাঙ্ক

যদি সকল জাতির সম্মতি অনুসারে পৃথিবীর পণ্যের পরিমাণ বুঝিয়া মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে তবেই ইহা সম্ভব। ইহাতে স্বর্ণমান একেবারে পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্বর্ণের অনুপাতে প্রত্যেক দেশের নোট প্রচলন করিবার ক্ষমতা আরও কিছু বাড়াইয়া দিতে হইবে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে হিসাব-নিকাশ হইয়া যে দেনা দাঁড়াইবে শুধু তাহা স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধ করিলেই চলিবে। এমনও কেহ কেহ বলেন, দেনা স্বর্ণ দ্বারা পরিশোধ না করিয়া জিনিষের দ্বারা পরিশোধ করিবার অধিকার দিতে হইবে। আবার এরূপ মতও কেহ কেহ পোষণ করেন যে, পৃথিবীর সকল দেশের স্বর্ণ-তহবিল আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের (League of Nations এর) কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জিম্মায় থাকিবে এবং সেখানে প্রত্যেক দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী লেন-দেন হইয়া হিসাবে জমা-খরচ হইবে। কিন্তু এই পন্থা কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রত্যেক দেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছানুবর্ত্তিতাকে অনেকখানি লোপ করিয়া দিতে হইবে। বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য তাহার একান্ত আবশ্যকতা থাকিলেও সেই মনোভাবের নিতান্তই অভাব দেখা যাইতেছে। অথচ এত আলোচনা এবং চিন্তার পরও অন্য কোন পন্থা নির্দ্দেশ আজ পর্য্যন্তও হইল না।*

---

* স্বর্ণমান পরিত্যাগের ফলে স্বাভাবিক নিয়মে বিনিময়ের হার নিরূপণের আর কোন সহজ পন্থা না থাকায় কতকগুলি দেশের মধ্যে চুক্তি দ্বারা মুদ্রার পারস্পরিক মূল্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা বর্ত্তমানে চলিয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা স্বর্ণ সংগ্রহ সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না; কিম্বা সকল দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত হওয়াও সম্ভব নহে।

ভারতে মুদ্রানীতি

কোন দেশের আর্থিক উন্নতির সহিত সেই দেশের মুদ্রাসম্পর্কীয় নীতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ কথা ভুলিলে আমাদের বর্ত্তমান যুগে চলিবে না। অথচ ইহা বলা বোধ হয় মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, এ সম্পর্কে আমাদের অত্যন্ত জ্ঞানাভাব। আমাদের বিদ্বজ্জন-সমাজে আজও এমন লোকের অসদ্ভাব নাই যাঁহারা মনে করেন এবং অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিয়াও থাকেন, "গবর্ণমেণ্টের আর ভাবনা কি, টাকা তৈরি করিবার জন্য টাকশাল রহিয়াছে, যখন যত খুসী টাকা ও নোট প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল।" রহস্য এই যে, শ্রোতাদের মধ্যেও এ-সব বিষয়ে অনেকের ধারণা অনেকটা পরকালতত্ত্বের ন্যায়ই অস্পষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের পক্ষেও নীরব গাম্ভীর্য্যের সহিত এ-সব বিজ্ঞজনোচিত উক্তি মানিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু বিষয়টা মোটেই হাস্যরসাত্মক নহে, পরন্তু ইহা যেমনি জটিল তেমনি আমাদের পক্ষে মারাত্মক; কারণ আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য, অন্নবস্ত্র—এক কথায়, আমাদের জীবন-মরণের অনেকখানি ইহার হাতে। বৃটিশ-শাসনে "শান্তি ও শৃঙ্খলা" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আমাদের ধনরত্ন চোর-ডাকাত ঠগের হাত হইতে অনেকটা নিরাপদ হইয়াছে; সিপাই-শান্ত্রী, আইন-আদালত, জজ-কঁউসিলি সকলে মিলিয়া ধর্ম্মরাজের চতুর্দ্দোল সগৌরবে বহন করিতেছে—এ সবই সত্য এবং এ-সব কথা আজকাল আমাদের স্কুলের ছোট ছোট বালকেরাও জানে। কিন্তু যাহা আজিকার দিনে আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে ও শিখিতে হইবে তাহা হইতেছে

এই যে, বর্ত্তমান যুগে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যেও নিপুণ অদৃশ্য হস্তে পরস্বাপহরণ চলিয়াছে এবং এক জাতি অপর জাতির দৌলতে ফাঁপিয়া উঠিতেছে। ইহারই নাম scientific exploitation বা বৈজ্ঞানিক পন্থায় ধনমোক্ষণ। এইরূপ নীরব প্রক্রিয়ার ফল শত শত নাদির শার লুণ্ঠন অপেক্ষাও অনেক দুর্ব্বল জাতির পক্ষে ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রেরই একটি বড় অধ্যায়— ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মুদ্রা মানুষের দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে মধ্যস্থ হইয়া কার্য্য করে এবং এই ভাবে বিভিন্ন মানুষ ও দেশের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের সুবিধা করিয়া দেয়। ইহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে জামিন-স্বরূপ দাঁড়াইয়া বিক্রেতাকে বলিতে থাকে, "তুমি তোমার পণ্যের বিনিময়ে অন্য কোন পণ্য দাবী করিও না, তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে গ্রহণ কর, আমি তোমার সকল প্রয়োজন মিটাইব।" এইরূপ ব্যাপক যাহার প্রয়োজনীয়তা তাহা এমন একটা বস্তু হওয়া আবশ্যক যাহা আকারে বা পরিমাণে বিস্তৃত হইবে না এবং যাহাকে রক্ষা করিতে বা হস্তান্তর করিতে অসুবিধা হইবে না। অধিকন্তু তাহা টেকসই হইবে এবং জগতে তাহার নিজের একটা প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য থাকিবে। এই কারণে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু মুদ্রা-জগতে একাধিপত্য করিয়া কৌলীন্য লাভ করিয়াছে। কোন কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া ধনী হইতে পারেন না; কারণ তাহাকে স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি ধাতু বাজার হইতে মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইবে এবং সাধারণ নিয়মানুযায়ী ধাতুর যাহা মূল্য তাহাই মুদ্রার মূল্য-স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এখানে কাগজের তৈরী নোটের কথা উঠিতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট নোটের

প্রচলন করিলেও নোটের বিনিময়ে টাকা বা মুদ্রা দিবার আইনসঙ্গত দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বদাই রহিয়াছে এবং তদ্দরুণ তাহাকে স্বর্ণ বা রৌপ্য তহবিল পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। কোন গবর্ণমেণ্ট যখন নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্য দিতে অসমর্থ হন (যেমন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সম্প্রতি ঘটিয়াছে) তখন সেই গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা কোন বিশেষ কারণে সঙ্কটাপন্ন এবং এই ব্যবস্থা সাময়িক বুঝিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সরকারী টাকশালে স্বর্ণ বা রৌপ্য জমা দিয়া নিখরচায় মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইবার অধিকার সকল সভ্য দেশের প্রজাবর্গের সাধারণ অবস্থায় রহিয়াছে। এই অধিকার হইতে আমরা ভারতবাসী ১৮৯৩ সালের আইনদ্বারা বঞ্চিত হইয়াছি এবং সম্ভবতঃ তাহারই ফলে উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। সমর-ঋণ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কর্ম্মদ্বারা পাশ্চাত্য দেশসমূহ আত্মকৃত ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া সঙ্কটকালে যে সকল বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহা বর্ত্তমান আলোচনায় ধর্ত্তব্য নহে। সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনীতির যে-সকল হিতকর মূলসূত্র সভ্যদেশে অনুসৃত হয়, সেই সব সূত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতের অবস্থা বিচার করিতে হইবে। উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা এইরূপ দুইটি সাধারণ নীতি বা সূত্রের পরিচয় পাইয়াছি—(১) প্রত্যেক দেশের প্রধান মুদ্রার বাহিরের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সহিত তাহার অন্তর্গত ধাতুর মূল্যের কোন প্রভেদ থাকিবে না; (২) সর্ব্বসাধারণের সরকারী টাকশাল হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লইবার অবাধ অধিকার থাকিবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে ইহার কোনটাই বিদ্যমান নাই। অর্থশাস্ত্রে যাহাকে

অন্ত্যজ বা হীন মুদ্রা (base or token coin) বলে, ভারতের রৌপ্যমুদ্রা সেই শ্রেণীর। ইহার ধাতুর মূল্য অপেক্ষা গবর্ণমেন্ট-নির্দ্ধারিত মূল্য প্রায় দ্বিগুণ। বিশ্বের আর কোন উন্নতিশীল জাতির প্রধান মুদ্রার এরূপ হীন অবস্থা আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। প্রথম নীতির ব্যতিক্রম ঘটিলে দ্বিতীয় নীতিকেও পরিহার করা ভিন্ন উপায় থাকে না। অন্যথা স্বল্প মূল্যের ধাতুদ্বারা অধিক মূল্যের মুদ্রা লাভ করিয়া রাতারাতি ধনী হইবার সহজ কল্পনায় সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিবে!

অবাধ বাণিজ্য ও বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনা সহজে নিষ্পত্তি করিবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থা যথাসম্ভব সহজ ও সরল হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দেশের মুদ্রা যদি পূর্ণ মূল্যের স্বর্ণ বা রৌপ্য ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দায় মিটাইবার জন্য মুদ্রার অপ্রতুল হইলে প্রয়োজন অনুযায়ী যদি সরকারী টাকশাল হইতে উহা প্রস্তুত করিয়া লওয়া বিধিমত সম্ভব হয়, তাহা হইলে অন্তর ও বহির্বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটান সম্পর্কে অনেক সমস্যার হাত হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। এমন কি যুদ্ধবিগ্রহাদি গুরুতর ও অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনার তুলাদণ্ড একদিকে অতিরিক্ত ভারী হইয়া অধিকাংশ স্বর্ণ বা রৌপ্য এক দেশ হইতে অপর দেশে উধাও হইবার সম্ভাবনা না ঘটিলে (সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে যাহা ঘটিয়াছিল) ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা মুদ্রাব্যাপারে আর কিছু হইতে পারে না। বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিবার চেষ্টা করা যাক। যদি দুইটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দেশের প্রধান মুদ্রার কোনরূপ ঘাটতি না থাকে, অর্থাৎ যদি উহাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মূল্য একই হয় এবং দুইটি দেশই যদি স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে মুদ্রানীতির মারপ্যাচে কোন পক্ষের

ঠকিবার কোনরূপ সম্ভাবনা থাকে না এবং তাহাদের মধ্যে দেনা-পাওনা স্থির করা বা মিটানও সহজ হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকার ডলার, ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং ও ফ্রান্সের ফ্র্যা মুদ্রার কোনটিতে কি পরিমাণ স্বর্ণ আছে, আমরা জানি। সুতরাং যোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে অন্যান্য জিনিষের ন্যায় স্বর্ণের বাজার-দর কম-বেশী হইলেও তিনটি দেশের স্বর্ণমুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য ঠিকই থাকিবে এবং দেনা-পাওনা মিটাইতে গিয়া কাহাকেও বিনিময়ের হেরফেরে পড়িয়া ঠকিতে হইবে না। রৌপ্যমুদ্রাবিশিষ্ট দেশসমূহের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি এক দেশে স্বর্ণমুদ্রার ও অপর দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন থাকে, তাহা হইলেই উহাদের মধ্যে হিসাব-নিকাশের সময় কিছু গোল হইবার সম্ভাবনা। কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের হার কোনও ধাতুর সাময়িক আধিক্য বা অল্পতা হেতু কখনও কখনও কম বা বেশী হইতে পারে এবং তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে দেনা-পাওনার পরিমাণ নড়চড় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটে। কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী ১৫,০০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং মূল্যের বিলাতী কাপড়ের 'অর্ডার' দিবার সময় যদি বিনিময়ের হার প্রতি টাকায় ১ শিলিং ৬ পেনি হয়, তাহা হইলে তাহাকে মূল্য বাবদ ২,০০,০০০৲ টাকা দিলেই চলিবে। কিন্তু তাহার পরেই যদি রূপার দর পড়িয়া গিয়া বাট্টার হার ১ শিলিং ৪ পেনি দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ জিনিষের জন্য ২, ২৫,০০০৲ টাকা মূল্য দিতে হইবে। কেবল বাট্টার দরুণ তাহাকে এ ক্ষেত্রে ২৫,০০০৲ টাকা বেশী দিতে হইতেছে! ঠিক তেমনি যদি কোন ইংরেজ বণিক আমাদের দেশে বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনি থাকাকালীন ২,০০,০০০৲ টাকার পাটের অর্ডার দেয়, আর মূল্য দিবার সময় বাট্টার হার ১ শিলিং ৪ পেনি হয়, তাহা হইলে তাহাকে ১৫,০০০

পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে মাত্র ১৩,৩৩৩ পাউণ্ড ৬ শিলিং ৮ পেনি দিলেই চলিবে। দুই দেশের মুদ্রা যদি দুই ভিন্ন ধাতুর হয়, তাহা হইলে মূল্যের এইরূপ তারতম্য এবং তদ্দরুণ একের লাভ ও অপরের ক্ষতি সময় সময় অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাও অনেকটা নিবারণ করিতে পারা যায় যদি সরকারী টাকশাল হইতে মুদ্রা তৈরী করিয়া লইবার অবাধ অধিকার জনসাধারণের থাকে। কি ভাবে তাহা বলিতেছি। বিনিময়ের হার কমিলেই কেমন করিয়া আমদানী মালের দর বৃদ্ধি এবং রপ্তানী মালের দর হ্রাস পায় তাহা উপরের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখিয়াছি। ইহার ফলে বিদেশী পণ্যের আমদানী কমিতে থাকে ও দেশী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বেশী হইলেই তাহার মূল্য দিবার জন্য অধিকতর টাকার আবশ্যক হয় এবং তজ্জন্য অধিকতর টাকার প্রয়োজন হয়। ফলে রৌপ্য মূল্যের পুনঃবৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ঘটে এবং বিনিময়ের হার পূর্ব্বাবস্থা বা সমতা (parity) লাভ করিবার চেষ্টা করে। আমাদের লেন-দেন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত। তারপর আর যে-সকল দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্যাদির দরুণ আর্থিক সম্পর্ক তাহাদের অধিকাংশ স্বর্ণমানবিশিষ্ট। ভারতে রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণের প্রচলন হইলে বিনিময়ের কবলে পড়িয়া আমাদিগকে এভাবে ভুগিতে হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অর্থশাস্ত্রের সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মগুলি হইতে বিচ্যুত হইয়া কেবলই সমস্যার পর সমস্যায় পতিত হইতেছি এবং শতছিদ্র-বিশিষ্ট মৃৎপাত্রে বারিধারণের ব্যর্থ প্রয়াসের ন্যায় আমাদের মুদ্রা-সমস্যা-সমাধানের সকল চেষ্টা প্রতিহত হইতেছে। সেই ব্যর্থ চেষ্টার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এক্ষণে আলোচনা করিব।

দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-প্রাধান্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকায় সহস্রাধিক

বৎসর যাবৎ স্বর্ণমুদ্রাই এতদঞ্চলে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিল। উত্তর ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বিবিধ মুদ্রারই প্রচলন ছিল; কিন্তু বাদশাহগণ রৌপ্যমুদ্রাকেই অধিকতর প্রাধান্য দিতেন। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট করা ছিল না—মুদ্রামধ্যস্থিত ধাতুর মূল্য অনুযায়ী হার স্থির করা হইত। এদিকে ধাতুর মূল্য পরিবর্ত্তনশীল; ইহাতে কাজকর্ম্মের অসুবিধা হয় দেখিয়া ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাদের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট বাট্টার হার বাঁধিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধাতুর বাজার-দর স্থির না থাকায় নির্দ্দিষ্ট হারে দ্বিবিধ মুদ্রার (Bimetalism-এর) প্রচলন অসম্ভব হয় এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে আইন-প্রণয়ন দ্বারা সমগ্র ভারতের জন্য এক তোলা ওজনের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন বিধিবদ্ধ করা হয়। দেনা পরিশোধের জন্য স্বর্ণমুদ্রা লইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আর বাধ্য রহিলেন না। এইরূপে দ্বৈত মুদ্রার পরিবর্ত্তে ভারতে এক রকম মুদ্রার (monometalism-এর) প্রচলন হয়। কেন যে স্বর্ণের পরিবর্ত্তে রৌপ্যের উপর কর্ত্তৃপক্ষের সুনজর পতিত হইল তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায় না। একটা কারণ এই বলা হয় যে, ভাবতবাসীরা স্বর্ণ বড় ভালবাসে, স্বর্ণমুদ্রা পাইলেই তাহা সিন্দুকে পুরিবে. নয়ত বাঁশের চোঙ্গায় বা ঘড়ায় করিয়া মাটিতে পুতিবে এবং এইভাবে অল্প সময় মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা অদৃশ্য হইয়া কাজ অচল হইবে। ইহার মূলে যেটুকু সত্য আছে তার জন্য আমাদের যাহারা ;দোষারোপ করেন তাহারাই যে দায়ী এবং এই অজুহাতে ভারতবাসীকে স্বর্ণমান হইতে বঞ্চিত রাখা যে যুক্তি বা ন্যায়সঙ্গ নহে তাহা চেম্বারলেন কমিশনের বিখ্যাত সদস্য স্যার জেম্‌স্ বেগ্‌বি সাহেবের নিম্নলিখিত অভিমত হইতে বুঝিতে পারা হইবে :—

"যে নীতি ভারতে হীনমুদ্রা প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সেই নীতিই ভারতবাসীর এইরূপ গোপন সঞ্চয়ের অভ্যাসের জন্য বহুল অংশে দায়ী। ভারতীয় টাক্‌শাল হইতে রৌপ্য-বিনিময়ে পূর্ণ মূল্যের মুদ্রা পাইবার অধিকার ১৮৯২ সালে রহিত হইয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের জনসাধারণ পুরুষানুক্রমে পূর্ণ মূল্যের মুদ্রা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। তাই আজ আর তাহারা তাহাদের লাভ ও সঞ্চয় ফাঁপান মূল্যের হীন টাকার আকারে রাখিতে প্রস্তুত নহে।"* এ'কথার মধ্যে যে অনেকখানি সত্য রহিয়াছে তাহা প্রমাণের আবশ্যক করে না। তবে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে স্বর্ণের চাহিদা হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহের মুদ্রাব্যবস্থা মধ্যে একটা বিপ্লব আনয়ন করিবে এই আশঙ্কা আমাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণে অনেকাংশে দায়ী ইহাতে সম্ভবতঃ সন্দেহ নাই। যাহা হউক স্বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য গ্রহণই ভারতের ভাগ্যে কাল হইল—কেমন করিয়া তাহা পরে বলিতেছি।

১৮৩৫ সালের আইন দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা রদ করা হইলেও জনসাধারণ তাহাদের কাজকর্ম্মের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দাবি করিতে লাগিল। ফলে

---

* "The hoarding habit is to a large extent the outcome of the policy which has brought into existence token currency. Up to the closing of the mints in 1893 to the free coinage of silver. the public had been accustomed for generations to full value coins for their currency requirements and they are not now prepared to hold their profits and savings in the form of over-valued rupees."

১৮৪১ সালে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারী রাজকোষে স্বর্ণমোহর গ্রহণ করিবার আদেশ প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন। মোহরে ও টাকায় একই ওজনের (এক তোলা) সোনা ও রূপা ছিল এবং কয়েক শতাব্দী যাবৎ সোনার দর রূপা হইতে প্রায় পনর-গুণ বেশী চলিয়া আসিতেছিল; সেই কারণেই এক মোহরের মূল্য পনর টাকা বলিয়াই জনসাধারণ এতকাল জানিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত স্বর্ণখনি আবিষ্কারের ফলে সোনার দর কমিতে সুরু করিল এবং জনসাধারণ ১ মোহর = ১৫৲ টাকা এই পুরাতন হার অনুযায়ী কোম্পানীর দেনা সোনায় মিটাইয়া লাভবান হইতে লাগিল।

সরকারের নিকট যাহার ত্রিশ টাকা দেনা ছিল তিনি দুই মোহর দিয়া রেহাই পাইলেন; অথচ সোনার দর পড়িয়া যাওয়ায় বাজারে ২ মোহরের মূল্য তখন হয়ত ২৮৲ টাকার বেশী নয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের গুরুতর ক্ষতি হইতে লাগিল এবং ১৮৫২ সালে গবর্ণমেণ্ট নোটিফিকেশন দ্বারা রাজকোষে মোহর গ্রহণ পুনরায় রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু দেশে স্বর্ণমান প্রচলনের জন্য তীব্র আন্দোলন সুরু হইল। প্রত্যেক রাজস্ব-সচিব ভারতের প্রকৃত মঙ্গল উপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বর্ণমানের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন; এমন কি ১৮৬৪ সালে একটি পরিকল্পনা তখনকার রাজস্ব-সচিব খাড়া করিলেন। কিন্তু এত আন্দোলন সত্ত্বেও ভারত-সচিবের অনুগ্রহ না হওয়ায় আমাদিগকে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইল। ভারতবাসীরা প্রকৃতই স্বর্ণমুদ্রা চাহে কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার টাকশালে প্রস্তুত স্বর্ণমুদ্রা মাত্র ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পাওনার পরিবর্ত্তে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপ জোড়াতাড়া

নীতিতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না এবং দেশীয় টাকশালে প্রস্তুত পুরাদস্তুর স্বর্ণমানের জন্য আন্দোলন বাড়িয়া চলিল। ফলে যেমন সর্ব্বদা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে—একটি রয়্যাল কমিশন আমাদের দাবি পরীক্ষার জন্য বসিল। তাঁহারাও জনমতের আন্তরিকতা ও যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার অনুকূলেই মত প্রকাশ করিলেন; কিন্তু পরিণামে কিছুই হইল না।

১৮৭১ সালে জার্ম্মাণী রৌপ্যমান পরিহার করিয়া স্বর্ণমান গ্রহণ করে। ডেনমার্ক, হলাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশও জার্ম্মাণীর পদাঙ্কানুসরণ করে। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালী প্রভৃতি যে-সকল দেশে দ্বৈত মুদ্রার প্রচলন ছিল তাহারাও উভয় মুদ্রার বিনিময়ের হার ঠিক রাখিতে অসমর্থ হইয়া রৌপ্যমুদ্রার অবাধ তৈরি বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে রূপার চাহিদা হঠাৎ অত্যন্ত হ্রাস পাইয়া তাহার মূল্য খুব কমিয়া যায়। এই সঙ্কট সময়ে ভারতবর্ষেও স্বর্ণমান প্রচলনের জন্য বিখ্যাত রাজস্ব-সচিব স্তার রিচার্ড টেম্প্‌ল আর একবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৮৭৩ সালের মে মাসে—তাঁহার পদত্যাগের একমাস পরেই, ভারত-গবর্ণমেণ্ট কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়াই তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পরিণাম ভারতের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭২ সাল ও ১৮৯৩ সালের মধ্যে টাকার মূল্য ২ শিলিং হইতে ১ শিলিং ৩ পেনিতে নামিয়া আসে। ফলে সস্তা রূপা খুব অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষে আমদানী হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহা মুদ্রায় পরিণত হইয়া বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। প্রয়োজন-অতিরিক্ত মুদ্রা বাজারে চলিতে থাকায় অর্থনীতির যোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুসারে ভারতে জিনিষের দর চড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে ইউরোপে সোনার দর রূপার তুলনায় চড়া থাকায় সেখানকার

জিনিষের দর কমিতে থাকে। সেই কারণে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বিশ্বের হাটে কমিয়া গিয়া বিদেশী জিনিষের চাহিদা ভারতের হাটে অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং ইহাতে ভারতের গুরুতর অর্থহানি ঘটিতে সুরু করে। ভারত-সরকারের ক্ষতির পরিমাণও প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিতে থাকে। ভারত-সরকারকে প্রতি বৎসর প্রায় ৩॥ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং "হোম চার্জ্জেস' দরুণ বিলাতে পাঠাইতে হয়। ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ও গোরা সৈন্যবাহিনীর মাহিনা, ভাতা, পেন্সন, ভারতীয় রেল ও পূর্ত্ত বিভাগের জন্য ধার করা টাকার সুদ, বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস ও হাই কমিশনার অফিসের খরচাদি বাবদ এই টাকা আমাদিগকে দিতে হয়। ইহা ভারতের পক্ষে নিছক ক্ষতি কিংবা ইহার বিনিময়ে আমরা যাহা পাই তদ্দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ হয়, সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। যাঁহারা টাকা দেন তাঁহাদের এক মত এবং যাঁহারা টাকাটা পান তাঁহাদের অবশ্য অন্য মত। যাহা হউক, বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিরাট ও বিরোধী বিষয় লইয়া আলোচনার প্রয়োজন নাই। মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। টাকার দর ২ শিলিং থাকাকালীন 'হোম চার্জ্জেস' দরুণ প্রায় ৩॥ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং পরিশোধ করিতে আমাদিগকে যত টাকা দিতে হইত, টাকার দর যখন ১ শিলিং ৩ বা ৪ পেনিতে নামিয়া আসিল, তখন আমাদিগকে তদপেক্ষা একেবারে এক-তৃতীয়াংশ বেশী দিতে হইল। অর্থাৎ কেবল বাট্টার হেরফেরের জন্য আমাদের দেনা ১ কোটি ১৭ লক্ষ পাউণ্ড (অর্থাৎ ১৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা) প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইয়া গেল! শুধু তাহাই নহে, বাট্টা বা বিনিময়ের হারের এরূপ অনিশ্চয়তার দরুণ বিদেশের সহিত বাণিজ্য করা কঠিন হইয়া উঠিল; কারণ কাহারও পক্ষে লাভ ক্ষতির পরিমাণ স্থির করিয়া কার্য্য করা আর সম্ভব রহিল

না। বিনিময়ের হার নামিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে যে অতিরিক্ত টাকা দিতে হইল তাহাও আমাদিগকে পণ্য বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে হইল এবং তাহার মূল্যও বাট্টার জন্যই আমরা আবার কম করিয়া পাইলাম। টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ভারত সরকার তাহার তহবিলের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য লবণ-কর ইত্যাদি বৃদ্ধি করিলেন। ফলে যাহারা পূর্ব্বেই একবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদেরই উপর পুনরায় জুলুম হইল। ভগবান যে বিপুল নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্য ভারতকে দান করিয়াছেন, সেই ঐশ্বর্য্য আহরণ করিতে হইলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। অর্থের প্রধান হাট লণ্ডন। সেখানে সমস্ত কারবার স্বর্ণের মারফতে হয়; ভারতবর্ষের কারবার রৌপ্যে; আবার তাহারও মূল্যের স্থিরতা নাই। কাজেই বাট্টার গোলমালে বিদেশীয় অর্থ ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য-বিস্তারের সহায়তার জন্য তেমন আসিতে পারিল না। এক হিসাবে ইহাও আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইল।

এই সব কারণে ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্য্যন্ত স্বর্ণমান প্রচলন ও রৌপ্যমুদ্রার অবাধ নির্ম্মাণ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-সঙ্ঘ প্রভৃতির পক্ষ হইতে জোর আন্দোলন চলিতে থাকে। ১৮৭৮ সালে ভারত সরকার স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি স্কিম পেশ করিলেন বটে; কিন্তু ভারত-সচিব তাহা নাকচ করিয়া দিলেন। এদিকে ১৮৬৭ সাল ও ১৮৯২ সালের মধ্যে যে চারিটি আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসে, ভারত সরকার তাহার সহযোগিতায় বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট করা যায় কিনা সেই চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। সেই দিকেও নিরাশ হইয়া ১৮৯২ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্ট পুনরায় ভারত-সচিবের নিকট নিম্নলিখিতরূপ একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন—

(১) স্বর্ণমান প্রচলন উদ্দেশ্যে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক টাকশাল হইতে

রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত রহিত করিয়া দেওয়া হউক; (২) তদ্বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের অবাধ অধিকার সর্ব্বসাধারণকে দেওয়া হউক; (৩) স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরের গড় হার পরীক্ষা করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা হউক; (৪) বিলাতের মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রার ন্যায় এদেশে চলিতে দেওয়া হউক এবং রৌপ্যমুদ্রার সহিত ইহার বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্দিষ্ট করা হউক। ভারত-সচিবের নির্দ্দেশ মত হার্সেল কমিটি এই প্রস্তাব পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ১৮৯৩ সালে যে মুদ্রা-আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহার ফলে ভারতীয় টাকশালে সাধারণ কর্ত্তৃক রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু অবাধ স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের কোন ব্যবস্থা করা হইল না। ভারতীয় রাজকোষ হইতে টাকা দিয়া গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণ হইতে স্বর্ণথান ও স্বর্ণমুদ্রা ১ শিলিং ৪ পেনি হারে (১ শিলিং ৬ পেনি নহে) গ্রহণ করিবেন ইহাই মাত্র স্থির হইল। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান দোষ এই থাকিয়া গেল যে, গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণথানের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে বাধ্য থাকিলেও টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ দিবার কোন বাধ্যবাধকতা তাঁহাদের রহিল না। এই অবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা ও হীন রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্ধারিত ১ শিলিং ৪ পেনি হার স্থির রাখা সম্ভব হইতে পারে না। কারণ বাট্টার হার বাঁধিয়া দেওয়া হইল কিন্তু বাজারের দুইটি ধাতু বা মুদ্রার পরিমাণ স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৮৯৩ সালের পরেও রূপার দর কমিয়াই চলিল এবং বিনিময়ের হার ১ শিলিং ১$\frac{1}{2}$ পেনি পর্য্যন্ত নামিল। ১৮৯৮ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় একটি প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন

তাহার ফলে ফাউলার কমিটি নামে যে কমিটির নিয়োগ হইল তাঁহারা ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ না করিলেও পূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলনের পক্ষেই মত নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এইরূপ—(১) বিলাতের স্বর্ণমুদ্রা (সভারিন) ভারতে অবাধে চলিতে পারিবে; (২) ভারতীয় টাকশালে অবাধে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারিবে; (৩) স্বর্ণ অবাধে আমদানী ও রপ্তানী হইতে পারিবে (ইহা পূর্ণ স্বর্ণমানের একটী প্রধান লক্ষণ); (৪) গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণের বিনিময়ে টাকা দিবেন বটে কিন্তু নূতন টাকা আর প্রস্তুত করিতে পারিবেন না, যে পর্য্যন্ত না সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্বর্ণমুদ্রা বাজারে ছড়াইয়া পড়ে; (৫) হীন মূল্যের টাকা প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রতি টাকায় যে ।৵০, ।৶০ লাভ করেন তাহা সরকারী সাধারণ তহবিলে জমা করা হইবে না। ইহা দ্বারা স্বর্ণমান প্রচলনের উদ্দেশ্যে একটী স্বতন্ত্র স্বর্ণ তহবিল (Gold Standard Reserve) খোলা হইবে, যাহাতে সমস্ত রৌপ্যমুদ্রা ইহার সাহায্যে ধীরে ধীরে কিনিয়া লওয়া যাইতে পারে; (৬) গবর্ণমেণ্টকে যে অর্থ ভারতবর্ষে ব্যয় করিতে হয় টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহারা তাহা স্বর্ণমুদ্রায় করিবেন; (৭) বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৪ পেনি হিসাবে ধরা হইবে এবং টাকা হীনমুদ্রা হইলেও জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হইবে না।

স্বর্ণমানের প্রধান উপকরণ বা উপাদান নিজ দেশে অবাধে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার। এই গোড়ার অধিকারটি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তির দরুণ ভারতবর্ষকে দেওয়া হইল না। স্বর্ণ-তহবিল ধীরে ধীরে রৌপ্যমুদ্রাকে টানিয়া লইয়া স্বর্ণমানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, স্বর্ণতহবিল সৃষ্টির এই উদ্দেশ্যটিও ভারত-সচিব অনেকটা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ, এই স্বর্ণতহবিল ভারতবর্ষে না রাখিয়া ষ্টার্লিংএ রূপান্তরিত

করিয়া বিলাতে রাখা হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই তহবিলের একটা অংশ ভারতের রেলপথ-নির্ম্মাণে ব্যয় হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, অতিরিক্ত টাকার আবশ্যক হইলে রৌপ্য খরিদের মূল্য দিবার জন্য স্বর্ণ-তহবিলের একাংশ রৌপ্যমুদ্রারূপে ভারতবর্ষে রক্ষিত হইল। ভারতীয় পণ্যের মূল্য দিবার জন্য বা অন্য কারণে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে ভারত-সচিব বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া কাউন্সিল বিল বেচিতে সুরু করিলেন এবং এইরূপ বেচা-কেনার কোনরূপ পরিমাণ বা সীমা নির্দ্দেশ করা হইল না। ফলে বিদেশ হইতে ভারতে স্বর্ণ প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যে স্বর্ণ ভারতের প্রাপ্য এবং যাহা ভারতে আসিতে পারিলে নানা উপায়ে ভারতের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিত তাহা বিলাতেই রহিয়া গেল এবং তথায় আমাদের নামে জমা থাকিলেও অল্প সুদে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হইতে পারিল। এত বড় একটা বিরাট ধনভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্ব করিতে পাওয়া সহজ সুবিধা নহে। ইহাতে ইংলণ্ডের মর্য্যাদা ও ধনবল বাহিরে যেমন বাড়িয়া গেল, আমাদের ধন পরহস্তগত হওয়ায় তাহা সম্ভব হইল না। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নোটের টাকা দিবার জন্য যে পৃথক তহবিল (Paper Currency Reserve) রাখা হয় তাহা হইতে ১৯০৫ সালে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার স্বর্ণ জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠান হয়। ইহার অনুকূলে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, টাকা প্রস্তুতের জন্য ইংলণ্ডে রৌপ্য খরিদকালে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ আনাইয়া লইতে তিন-চার সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিত—ইহাতে সেই অসুবিধা আর হইবে না।

এখানে কাউন্সিল বিলের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমাদিগকে প্রতি বৎসর হোম চার্জ্জেস দরুণ যে অর্থ বিলাতে পাঠাইতে হয় তাহার

জন্য স্বর্ণ আবশ্যক। কিন্তু আমাদের মুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা নহে। বাজার হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিয়া জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইবার হাঙ্গামা ও খরচ এড়াইবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হইত। বিলাতের ব্যবসায়ীকে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার জন্য মূল্য দিতে হইবে; পক্ষান্তরে ভারতসচিব ভারতবর্ষ হইতে 'হোম চার্জ্জেস' বাবদ বহু অর্থ পাইবেন। সামান্য কিছু খরচ ও কমিশন ধরিয়া ভারত-সচিব ইংরেজ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তাহার দেয় স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেন এবং তদ্বিনিময়ে তাঁহার মারফতে ভারত সরকারের উপর একটি 'পে অর্ডার' দেন। ইহারই নাম কাউন্সিল বিল বা ড্রাফ্‌ট্‌স্। ইংরেজ ব্যবসায়ী ইহা ভারতীয় পাওনাদারের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং তিনি ট্রেজারী হইতে উহা ভাঙ্গাইয়া লয়েন। বিশেষ তৎপরতার প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত খরচ লইয়া টেলিগ্রামে অর্ডারটি পাঠান হয় এবং তাহাকে টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার বলে। ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত হোম চার্জ্জেসের পরিমাণ অনুযায়ী কাউন্সিল বিল বিক্রয় করা হইত। কিন্তু ১৮৯৩ সাল হইতে এই বিল যথেচ্ছ পরিমাণে ভারত-সচিব বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইহার কুফল উপরে উল্লেখ করিয়াছি। বিলাতী পণ্যের মূল্যের দরুণ বা অন্য কারণে আমাদিগকে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে হয়। আবার ভারত-সচিবেরও এদেশে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। এই অবস্থায় ভারতীয় ট্রেজারীতে টাকা জমা দিয়া আমরা 'রিভার্স কাউন্সিলস্' ক্রয় করিয়া আমাদের পাওনাদারের নিকট পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহা ভারত-সচিবের নিকট হইতে ভাঙাইয়া লইতে পারেন। এই কাউন্সিল বিল ও রিভার্স কাউন্সিল সদা-পরিবর্ত্তনশীল বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার অন্যতম উপায় স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। নির্দ্দিষ্ট হার হইতে টাকার মূল্য কমিবার সম্ভাবনা

হইলেই রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয়ের দ্বারা বাজার হইতে চল্‌তি টাকার পরিমাণ হ্রাস (contraction of currency) করিয়া ফেলা হইত। পক্ষান্তরে টাকার মূল্য বাড়িবার উপক্রম করিলেই ভারতসচিব কাউন্সিল বিল বিক্রয় করিতে সুরু করিতেন এবং তদ্দরুণ ভারতীয় ট্রেজারী হইতে টাকা বাহির হইয়া বাজারে ছড়াইয়া পড়িত। ফলে বাজারে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি (expansion of currency) পাইয়া তাহার মূল্য আর বাড়িতে পারিত না। অতিরিক্ত প্যাঁচান মুদ্রানীতিকে বাঁচাইবার জন্য ইহাকে অন্যতম ব্যর্থ চেষ্টা বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে ১৮৯৯ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত যে-ভাবে কাজ চলিতে লাগিল তাহার স্বরূপ সংক্ষেপে দিতেছি ঃ—

(১) টাকা ও বিলাতী সভারিন (পাউণ্ড ষ্টার্লিং) এই দ্বিবিধ মুদ্রাই আইনসঙ্গত প্রকৃষ্ট মুদ্রা (legal tender) রূপে গণ্য হইত; (২) সভারিনের মূল্য ১৫৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল (অর্থাৎ ১ শিলিং ৪ পেনি = ১৲ টাকা); (৩) স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করা চলিত; (৪) কিন্তু রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দাবি করা চলিত না, তবে প্রয়োজন অনুযায়ী ও সাধ্যমত তাহা দেওয়া হইত; (৫) টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনির নিম্নে নামিতে চাহিলে রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয় করিয়া যেমন তাহার মূল্যহ্রাস ঠেকান হইত, তেমনি টাকার মূল্য বাড়িবার উপক্রম করিলে উল্লিখিত ৩য় দফার বিধান অনুযায়ী বাজারে চলতি টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ কমাইয়া ফেলিয়া টাকার মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা করা চলিত।

এদিকে গবর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতি সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা এক ভাবেই চলিতে থাকে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজস্ব-সচিব স্যার অষ্টিন চেম্বারলেনের সভাপতিত্বে ১৯১৪ সালে এক কমিশন

নিয়োগ করেন। তাঁহারা অনেক গবেষণা করিয়া ভারতবাসীরা স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ চাহেন না এবং ভারতের জন্য রৌপ্যমুদ্রা ও নোট প্রচলনই প্রশস্ত, ইহাই নির্দ্ধারণ করেন এবং ঘটনাচক্রে 'গোল্ড এক্স্চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামে যে অভিনব মুদ্রানীতির প্রচলন হইয়াছে তাহাই সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। এদিকে ১৯১৪ সালে ইউরোপে লঙ্কাদহন পালা সুরু হয়; এবং বিশ্বব্যাপী অবস্থা-বিপর্য্যয়ের সহিত ভারতের এই অস্বাভাবিক মুদ্রার ব্যবস্থাও একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম, মালমশলা জোগাইবার জন্য ভারতের রপ্তানি অসম্ভব বৃদ্ধি পায়; অথচ প্রধান দেশসমূহ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ভারতে তাহাদের পণ্যের আমদানি স্বভাবতই অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভারত-সরকারকে বৃটিশ সরকারের পক্ষে ছয় বৎসরে ২৪ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং (অর্থাৎ ৩৬০ কোটি টাকা) ব্যয় করিতে হয়। এদিকে লড়াইয়ের দরুণ কোন দেশেই অন্যান্য জিনিষের ন্যায় রৌপ্যকেও হাতছাড়া করিতেছিল না। এই কারণে রূপার দর অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পায়। ১৯১৫ সালে প্রতি আউন্স রৌপ্যের মূল্য ২৭ পেনি ছিল; ১৯২০ সালে তাহা ৮৯ পেনিতে আসিয়া দাঁড়ায়! অতিরিক্ত রপ্তানির মূল্য দিবার জন্য যে অতিরিক্ত কাউন্সিল বিল বিলাত হইতে আসিতে লাগিল তদ্দরুণ এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বরাতি উল্লিখিত লড়াইয়ের ব্যয়সঙ্কুলনের দরুণ যে অত্যধিক টাকার প্রয়োজন হইল তাহার জন্য অগ্নিমূল্যে রৌপ্য খরিদ করিতে হইল। হিসাব বহির্ভূত এই বিরাট ব্যয়সঙ্কুলনের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টকে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতে এবং ১৯১৭-১৯ সাল মধ্যে ১৩০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। বিপাকে পড়িয়া ১৯১৯ সালে স্মিথ কমিটি নামে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ইঁহারা রৌপ্য মূল্যের এতাদৃশ বৃদ্ধি দেখিয়া

বিনিময়ের হার ১ শিলিং ৬ পেনির স্থলে একেবারে ২ শিলিং নির্দ্ধারিত করিলেন। বিলাতের দেনা দিবার জন্য ভারতে যে রিভার্স কাউন্সিল বিক্রয় করা হইত তাহার দাবি মিটাইতে হইত বিলাতের গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিজার্ভ ও পেপার কারেন্সি রিজার্ভ হইতে। এই তহবিলের স্বর্ণ কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য সিকিউরিটিতে খাটান হইত। টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি থাকা কালীন এই সব সিকিউরিটি খরিদ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে ভারত সরকার রিভার্স কাউন্সিল ২ শিলিং দরে বিক্রয় করায় ভারত-সচিবকে প্রতি টাকায় ৬ পেনি করিয়া বেশী দিতে হইল এবং ফলে ৪০ কোটি টাকার উপর ভারত-সরকারের ক্ষতি হইয়া গেল। এই সময়ে চারিদিক হইতে বিলাতে অর্থ পাঠাইবার ধুম পড়িয়া গেল; বিনিময়ের হার এতটা বাড়িয়া যাওয়ায় বিলাতী মালের দর আমাদের দেশে সস্তা হইল এবং আমাদের মালের দর বিলাতে চড়িয়া গেল। ফলে অত্যধিক আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি হ্রাস পাইয়া দেশ হইতে অর্থ বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজ বণিকগণ যাহারা এদেশে যুদ্ধের সময় বহু টাকা রোজগার করিয়াছিল তাহারা এইরূপ বাট্টার হারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া লাভের কড়ি সব বিলাতে পাঠাইতে লাগিল। ভাগ্যান্বেষীরা এই সময়ে লাভে বিলাতে টাকা পাঠাইয়া পুনরায় বাট্টার হার নামিলে লাভে টাকা এদেশে ফিরাইয়া আনিবেন মতলবে খুব রিভার্স বিল কিনিতে লাগিলেন। ফলে টাকার বাজার জুয়ার আড্ডায় পরিণত হইল এবং চারিদিকে একটা গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল।/ স্মিথ কমিটির একমাত্র ভারতীয় সদস্য স্যার দাদিবা দালাল টাকার মূল্য ২ শিলিং হার নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে খুব জোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল

তাহা স্যার ষ্ট্যানলী রিডের নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

> A policy which was avowedly adopted to secure fixity of exchange produced the greatest fluctuations in the exchanges of a solvent country and widespread disturbances of trade, heavy losses to the Government and brought hundreds of big traders to the verge of bankruptcy.

স্মিথ কমিটির নিতান্ত অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত বজায় রাখিতে অসমর্থ হইয়া ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ভারত সরকার নিশ্চেষ্টভাবে ঘটনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন—যদি দৈবাৎ সুদিনের নাগাল পাওয়া যায় এই ভরসায়। ১৯২৫ সালে ষ্টার্লিংএর মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনিতে আসিয়া স্বর্ণমূল্যের সমান দাঁড়াইল এবং গবর্ণমেণ্ট টাকার মূল্যও ১ শিলিং ৬ পেনি অপেক্ষা যাহাতে অধিক না হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৯২৬ সালে হিল্‌টন্‌ ইয়ং কমিশন 'গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড' প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলেন। তাহার প্রধান সূত্রগুলি এইরূপ—যদিও আইনতঃ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করা হইবে না, তথাপি স্বর্ণদ্বারা জিনিষের মূল্যের পরিমাপ করা হইবে এবং রৌপ্যমুদ্রার মূল্য আইন করিয়া স্বর্ণের সহিত পাকাপাকি রকমে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট উক্ত বাঁধা হারে যথেচ্ছ পরিমাণ স্বর্ণপান সর্ব্বসাধারণের নিকট ক্রয় ও বিক্রয় করতে বাধ্য থাকিবেন; কিন্তু পরিমাণে কেহ ১০৬৫ তোলা বা ৪০০ আউন্সের কম সোনা দিতে বা চাহিতে পারিবেন না। নোট বা টাকার পরিবর্ত্তে যে-কোন উদ্দেশ্যে ন্যূনকল্পে উক্ত পরিমাণ স্বর্ণথান দাবি করা চলিবে।* স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে

---

* আইন-প্রণয়ন কালে ৪০ তোলার অনধিক স্বর্ণ ক্রয় করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য নহেন ইহাই নির্দ্ধারিত হয়।

সাধারণের চাহিদা মত স্বর্ণথান দিবার নিয়ম করায় অর্থের পরিমাণ সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা বিনিময়ের হার ঠিক রাখা অধিকতর সহজ হইবে এই ব্যবস্থা হইতে ইঁহারা এই সুবিধা আশা করিলেন। /একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার তাহার উপরে দিবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটী প্রস্তাবও ইঁহারাই করিলেন। এতকাল গবর্ণমেণ্ট বিনিময়ের যে হার নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন তাহা স্থির রাখা সম্বন্ধে তাঁহাদের আইনতঃ কোন দায়িত্ব ছিল না। এক্ষণে ঐ দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের উপর বিধিমত আরোপিত হওয়ায় বাট্টার অনিশ্চয়তা অনেকটা হ্রাস পাইল। কিন্তু বাট্টার এই হার নির্দ্ধারণ করা লইয়া তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। উক্ত কমিশনের সুবিখ্যাত ভারতীয় সদস্য স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ১ শিলিং ৬ পেনি হার নির্দ্ধারণে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া ১ শিলিং ৪ পেনি হার সমর্থন করিলেন। তিনি নানা প্রকারে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ১ শিলিং ৪ পেনিই স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের স্বাভাবিক হার। ১৮৯২ সালে হার্সেল কমিটি এই হারই নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাই পঁচিশ বৎসর কাল (১৮৯২ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত) চলিয়া আসিতেছিল।/ লড়াইয়ের অভাবনীয় বিভ্রাটের দরুণ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ১৯১৯ সালে স্মিথ কমিটি নিতান্ত গায়ের জোরে এই অস্বাভাবিক সাময়িক অবস্থাকে স্থায়ী করিবার চেষ্টা করেন—ভারতের ভাগ্যে তাহার পরিণামও ভয়াবহ হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্ট যখন এই ২ শিলিং হার রক্ষা করিবার নিষ্ফল চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন (১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) বিনিময়ের হার স্বাভাবিক নিয়মে ১ শিলিং ৪ পেনির কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছিল। সরকারী কাগজপত্র হইতে তিনি ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, স্বর্ণের সহিত রৌপ্যের যাহা স্বাভাবিক হার, তাহার

কিছু উর্দ্ধে হার নির্দ্ধারণ করিবার মতলব ভারত-সরকার পূর্ব্ব হইতে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রয়োজন অনুযায়ী মুদ্রার স্বাভাবিক প্রসারণ (expansion of currency) বন্ধ করিয়া বাট্টার স্বাভাবিক হার বেশী করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনি হইলে ভারতের সর্ব্বপ্রকারে কিরূপ অকল্যাণ হইবে তাহাও তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারতের কৃষিজীবী ও অন্যান্যের দেনার পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। ইহার অধিকাংশ দেনা যখন করা হয় তখন টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি ছিল; এক্ষণে উহার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি ধরা হইলে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া হেতু দেনার পরিমাণ প্রকৃত প্রস্তাবে শতকরা ১২॥০ আনা বৃদ্ধি পাইয়া যাইবে। ভারতের এই অসহায় গরিবদের কথা ভুলিলে চলিবে না। বিনিময়ের হার অকারণে বেশী না ধরিয়া ১ শিলিং ৪ পেনি ধরিলে বিদেশে আমাদের পণ্যের মূল্য ষ্টার্লিঙের হিসাবে কম পড়িবে এবং বিদেশী পণ্যের মূল্য টাকার হিসাবে এদেশে বেশী পড়িবে; সুতরাং আমাদের আমদানি কমিয়া রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে; বাণিজ্যের গতি (balance of trade) আমাদের অধিকতর অনুকূল হইবে—ফলে ধনাগম হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বাড়িবে। ইহাতে জিনিষের মূল্য চড়িলেও এতদ্দেশীয় শতকরা ৭৯ জন কৃষিজীবী তাহাদের কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বেশী পাইয়া লাভবানই হইবে। লেখাপড়া জানা অল্প বেতনের চাকুরিয়াদের কিছু কষ্ট হইবে সত্য কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বিবেচনা করিয়া তাহা ধর্ত্তব্য নহে। মজুরদের মজুরী লড়াইয়ের সময়ে অপ্রত্যাশিত ব্যবসা স্ফীতির দরুণ এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, জিনিষের দর কিঞ্চিৎ বাড়িলেও তাহাদের বর্দ্ধিত মজুরীর যোল আনাতে হাত পড়িবে না। "হোম চার্জ্জেস" বা বিদেশীয় অন্য দেনার জন্য আমাদিগকে যে টাকা

বেশী দিতে হইবে তাহা অতিরিক্ত শুল্ক ও অন্যান্য পাওনা ও সুবিধার দ্বারা পোষাইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহার মতের সহিত এক মত হইতে পারেন নাই, এবং ১৯২৭ সালের মুদ্রা-আইনে অন্যান্য সর্ত্ত সহ তাঁহাদের অনুমোদিত বাট্টার হারই বিধিবদ্ধ হয়। এই মুদ্রানীতির নামকরণ হইল—গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড (Gold Bullion Standard)।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুনিয়ার আর্থিক অবস্থা ভালর দিকেই চলিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই অপ্রতিহত গতিতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধোগতি হইতে সুরু করিল এবং দেশে দেশে বেকার সমস্যা বাড়িয়া চলিল। ১৯৩১ সালের নবেম্বর মাসে ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রৌপ্যমুদ্রাও স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পুনরায় ষ্টার্লিঙের সহিত যুক্ত হইল। বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনিই রহিল কিন্তু স্বর্ণের সহিত নহে, (পেপার) ষ্টার্লিঙের সহিত। ষ্টার্লিঙের সহিত সম্বন্ধ হেতু ইহাকে 'ষ্টার্লিং এক্স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বলা হয়। স্বর্ণমান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ষ্টার্লিঙের মূল্য যেমন অনির্দ্দিষ্টরূপে অনেকখানি নামিল, আমাদের রৌপ্যমুদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনিই নামিলেন। আজ পর্য্যন্ত সেই অবস্থাই চলিয়াছে—রাজার জয়ে জয়, রাজার ক্ষয়ে ক্ষয়। রাজভাগ্য অনুসরণ করা পরম সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু একটা ক্ষোভ এই যে, গোল্ড এক্স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ষ্টার্লিং এক্স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড, বুলিয়ন এক্স্‌চেঞ্জ ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি স্বর্ণমানের গিল্টি করা বহুরূপ আমরা রাজ-অনুগ্রহে দেখিলাম কিন্তু স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি এবং বহু তোড়জোড় সত্ত্বেও স্বর্ণমানের সহজ সুন্দর রূপটির দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে ধনাগম ও পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় তদুদ্দেশ্যে দুনিয়ার সব জাতিই আজ নিজ নিজ মুদ্রামূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া বিনিময়ের সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আমাদিগকে ১৯২৭ সাল হইতে বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেই যে ১ শিলিং ৬ পেনি হারের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই বন্ধন হইতে আজও আমাদের মুক্তি ঘটিল না। তবে আমাদের একটা পরম সান্ত্বনা এই, অর্থশাস্ত্রের মুদ্রাতত্ত্বের অধ্যায়ে আমাদের দান নাকি অমূল্য, বড় বড় পণ্ডিতেরা নাকি ইহা হইতে অনেক নূতন তথ্য জানিতে এবং অনেক চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করিতে পারেন।

আমাদের 'রেশিও' সমস্যা

রেশিও প্রশ্ন লইয়া ভারতব্যাপী একটা বড় ঝড় বহিয়া গেল। এত প্রচণ্ড তার আকর্ষণ যে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ হইতে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র পর্য্যন্ত টাল সামলাইতে পারেন নাই। আর আমরা অনেকেই ভালমন্দ বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়াছি। শাস্ত্রের কচ্‌কচি নীরব হইয়া আসিয়াছে, ঝড়ের বেগ কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং সাধারণের পক্ষে ধীর ভাবে বিষয়টি বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রারম্ভে 'রেট অব্‌ এক্‌শ্চেঞ্জ' বা বিনিময়ের হার, এই কথাটার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। প্রত্যেক দেশের মুদ্রার ওজন নির্দ্দিষ্ট করা হইলেও এক এক দেশের মুদ্রার ওজন এক এক রকম। এই ওজনের পার্থক্যের দরুণ ইহাদের মূল্যের যে তারতম্য, 'রেট অব্‌ এক্‌শ্চেঞ্জ' তাহাই গণিতের সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র। ইহাকেই সংক্ষেপে 'রেশিও' বলা হয়।

পৃথিবীব্যাপী মুদ্রাবিভ্রাট ঘটিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটা বিলাতী স্বর্ণমুদ্রা ফ্রান্সের ২৫·২২টি, জার্ম্মাণীর ২০·৪৬টি, এবং আমেরিকার ৪·৮৬টি স্বর্ণমুদ্রার সমতুল্য ছিল। একই ধাতুর বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণ করা খুবই সহজ। কিন্তু এক দেশের মুদ্রা স্বর্ণ-নির্ম্মিত, অপর দেশের মুদ্রা রৌপ্য-নির্ম্মিত হইলে, উভয় ধাতুর আপেক্ষিক

মূল্যের অ-স্থিরতা হেতু উহাদের মধ্যে বিনিময়ের হার নিরূপণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা ও ভারতের রৌপ্যমুদ্রার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় সেইজন্যই চিরকাল দুরূহতার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান আন্দোলন সেই বহু পুরাতন কলহেরই একটা নবপর্য্যায় মাত্র। ভারতের লেন-দেন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত; তথাপি কেন যে ইংরেজ সরকার ভারতে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করিয়া উভয় দেশের আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে এই নিদারুণ অনির্দ্দিষ্টতা বা ভেদের সৃষ্টি করিলেন তাহা বোঝা কঠিন। যাহা হউক, সেই আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে; এই সম্বন্ধে আমি "ভারতে মুদ্রানীতি" প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্।

কোন দেশের বাণিজ্যই আর এখন শুধু সেই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; গোটা দুনিয়ার সহিত এখন আমাদের কারবার। সেইজন্যই পরস্পরের দেনা-পাওনা স্থির করিবার জন্য বিভিন্ন দেশের মুদ্রামধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্দিষ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক। এতকাল ছিলও তাই। বিগত মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ইউরোপের দেশসমূহ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় এই নির্দ্দিষ্ট হারের নড়চড় হইয়া যায়। পরে শান্তিস্থাপনের সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু কিছুকাল মধ্যেই যুদ্ধের পরবর্ত্তী কুফল ধীরে ধীরে ফলিতে সুরু করে এবং ইংলণ্ড হৃতসর্ব্বস্ব হইবার অবস্থায় পড়িয়া ১৯৩১ সালে পুনরায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। সঙ্গে সঙ্গে জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশও আত্মরক্ষার জন্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তদবধি পৃথিবীব্যাপী এই মুদ্রাবিভ্রাটের

পালা চলিয়াছে, ইহার শেষ কোথায় কি ভাবে কেহ বলিতে পারে না।

স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া নিজের দেশের দেনা পরিশোধের জন্য স্বর্ণমুদ্রা দিবার দায় হইতে গবর্ণমেণ্ট রক্ষা পাইলেন, কেবল বিদেশের দেনা পরিশোধ করিবার বেলাই স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণথানের প্রয়োজন থাকিল। স্বর্ণমুদ্রার স্থান যখন কাগজের নোট অধিকার করিল, তখন মুদ্রার ধাতুমূল্য দ্বারা বিভিন্ন দেশমধ্যে বিনিময়ের হার নির্দ্ধারণের যে সহজ উপায়টি ছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা স্থির করা দুরূহ হইয়া পড়িল। স্বর্ণভ্রষ্ট হওয়ার ফলে ইংলণ্ড এবং ঐ পথাবলম্বী অন্যান্য দেশের মুদ্রার মর্য্যাদা বা কদর হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। যেখানে একটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং ৪.৮৬ ডলারের সমতুল্য ছিল সেখানে তাহার মূল্য দাঁড়াইল ন্যূনকল্পে ৩.৩০ ডলার।

আর্থিক জগতে ইংলণ্ডের মর্য্যাদা হানি হইল যথেষ্ট, কিন্তু সে প্রাণে বাঁচিয়া গেল। প্রথমতঃ, তহবিলের অবশিষ্ট স্বর্ণগুলি তাহার রক্ষা পাইল। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার মূল্য হ্রাস হেতু জিনিষের দর চড়িল। তৃতীয়তঃ, বিনিময়ের হার তাহার অনুকূল হওয়ায় রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস পাইয়া তাহার ধনাগম ও ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। অন্ততঃ প্রতিকূল হাওয়া অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হইল। হাজার পাউণ্ডের জিনিস ইংলণ্ড হইতে ক্রয় করিলে আমেরিকার বণিককে পূর্ব্বে দিতে হইত (১০০০ × ৪.৮৬) ৪৮৬০ ডলার, এক্ষণে দিতে হইল আনুমানিক (১০০০ × ৩.৩০) ৩৩০০ ডলার মাত্র। ইংলণ্ড তাহার পণ্যের দরুণ হাজার পাউণ্ডই পাইল বটে; কিন্তু আমেরিকাকে ১৫৬০ ডলার কম দিতে হইল। ফলে আমেরিকা ও স্বর্ণমান বিশিষ্ট অন্যান্য দেশে ইংরাজের মাল কেবলমাত্র বিনিময়ের

মারপ্যাচের দরুণ সস্তায় বিকাইতে লাগিল। পক্ষান্তরে উহাদের পণ্যের দর ইংলণ্ডের বাজারে চড়িয়া গেল। প্রবল প্রতিযোগিতায় ফলে দুনিয়ার হাটে পণ্য বিক্রয় এমনি দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তদুপরি মুদ্রার অবনতি ঘটাইয়া বাট্টার সুযোগ গ্রহণে ইংলণ্ডকে লাভবান হইতে দেখিয়া এই মন্দার বাজারে আমেরিকাও সেই পথের পথিক হইতে বাধ্য হইল। ফলে চারিদিকে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস করতঃ কে কাহাকে পণ্যের হাটে হটাইবে তাহার একটা রীতিমত দৌড় চলিয়াছে।

এই সম্পর্কে ভারতের অবস্থা সম্যক বুঝিতে হইলে অনভিজ্ঞের পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। সেইজন্যই দুনিয়ার আর্থিক সমস্যার এই দিকটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

ভারতের মুদ্রা রৌপ্য ধাতুর হওয়ায় পৃথিবীর স্বর্ণমুদ্রাবিশিষ্ট দেশ সমূহের সহিত বিনিময়ের হার বা 'রেশিও' লইয়া তাহার গোলমাল যে চিরন্তন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সোনা ও রূপার বাজার দরের পবিবর্ত্তন হেতু ষ্টার্লিঙের সহিত টাকার রেশিও স্থির করিবার কোন সহজ ও স্বাভাবিক উপায় না থাকায় ভারত-সরকার এই হার খেয়ালমত এক এক সময় এক এক রূপ নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছেন। ইহার ফল ভারতের পক্ষে শুভ হইতে পারে নাই। প্রথম কথা—বিনিময়ের হার পরিবর্ত্তনশীল হইলে লাভালাভ হিসাব করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, যাহা এইমাত্র আলোচনা করা হইল, বিনিময়ের হার বা রেশিও নির্দ্ধারণের উপর জিনিষের দর ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি অতি গুরুতররূপে নির্ভর করে। ১৮৯২ সাল হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত

টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেনি নির্দ্দিষ্ট ছিল; তৎপরে ১৯১৯ সালে টাকার মূল্য বাড়াইয়া একেবারে ২ শিলিং করা হয়। তাহার ফল ভারতের পক্ষে অতিশয় মারাত্মক হইয়া পড়িলে পুনরায় ১৯২৬ সালে এক রয়্যাল কমিশন বসে এবং উঁহারা টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাত ও অনিশ্চয়তার ভিতর দিয়া ভারতের মুদ্রা-সমস্যা এতকাল চলিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর বাণিজ্য তখন সম্প্রসারণের পথ বাহিয়া চলিতেছিল; ভারতের ক্ষতি তাই তেমন করিয়া তাহার গায়ে বাজিতে পারে নাই। কিন্তু আজ আর সেদিন নাই; আজ দু-কূল ভাঙ্গা খরস্রোতে উজান বাহিবার পালা সুরু হইয়াছে। আমাদের প্রভুদের অবস্থাও কাহিল। বড় বাড়ির আনন্দোৎসবের এতটুকু ছিটেফোঁটা পাইবার আশাও আজ আর দীন প্রতিবেশীর নাই। দুনিয়ার চারিদিকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আজ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। 'কাজ চাই, অন্ন চাই' রবে ইউরোপ আমেরিকার আকাশ বাতাস আজ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রপতিগণের চোখের নিদ্রা টুটিয়াছে। কোটি কোটি টাকার পণ্য পড়িয়া আছে, খরিদ্দার নাই, দর নাই। সকল দেশই নিজের পণ্য পরের দেশে চালান করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত; কিন্তু কেহই পরের পণ্য নিজের দেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না। যিনি দরে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তিনি পরের পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইতেছেন। তাহাতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিলে, স্বর্ণমুদ্রা ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব কাগজ চালাইতে সুরু করিয়াছেন; নয়ত মুদ্রার স্বর্ণ অপহরণ করিতেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুস্‌ভেল্ট কলমের এক খোঁচায় ডলারের ওজন সেদিন অর্দ্ধেক কমাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য নিজের দেশের জিনিষের দর চড়াইয়া দেওয়া এবং বিদেশের হাটে

প্রতিযোগিতায় অপরকে পরাস্ত করা। রাতারাতি আমাদের আধুলিগুলি টাকা হইয়া গেলে যা হয়, এ ঠিক তাই। অর্থশাস্ত্রের যাদুমন্ত্রে মানুষের হাল্‌কা পকেট যখন রাতারাতি দ্বিগুণ ভারী হইয়া উঠিবে তখন বাজারে ক্রেতার ভিড় নিশ্চয়ই কিছু বাড়িবে এবং নিজের পণ্য বিদেশে অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিবার সুবিধাও হইবে, ইহাই এই নীতির উদ্দেশ্য।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থা যখন এইরূপ, তখন আমাদের দেশের মুদ্রা-নীতি কোন পথে চলিয়াছে? ইহার সহজ উত্তর এই যে, আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথও নাই, চলাও বন্ধ। আমাদের এই চরম নিশ্চেষ্টতার দিকে তাকাইলে পুরাতন সেই প্রবাদটির কথা মনে পড়ে, কাঙ্গালের আবার বাটপাড়ের ভয় কি? সেই যে ১৯২৭ সালে সুদিনে আমাদের টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দুনিয়ার এত ওলটপালটের পরও সেই বাট্টা বা রেশিও-ই এখন পর্য্যন্ত স্থির আছে। পার্থক্যের মধ্যে এইটুকু, পূর্ব্বে সম্বন্ধ ছিল স্বর্ণ ষ্টার্লিঙের সহিত, এখন সম্পর্ক হইয়াছে পেপার ষ্টার্লিঙের সহিত; কারণ ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং এখন স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত। ১৯২৭ সালে রয়্যাল কমিশন কর্ত্তৃক ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও যখন নির্দ্ধারিত হয় তখনই কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য অর্থনীতি-বিশারদ স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুর পারস্পরিক মূল্য বিবেচনা করিলে বাট্টার হার কখনও ১ শিলিং ৪ পেনির বেশী হওয়া উচিৎ নহে। কিন্তু তাঁহার অভিমত অন্যান্য সদস্যগণ গ্রহণ করেন নাই। সুদিনে যে বাট্টার হার অধিক এবং ভারতের পক্ষে অহিতকর বলিয়া ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছিল, আজ এই বিশ্বব্যাপী ঘোর দুর্দ্দিনেও তাহাই স্থির আছে।

আমরা কোন্ হিসাবে বা কি সূত্রে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওকে বেশী বলিতেছি, এক্ষণে তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাক। লড়াইয়ের পর ইউরোপের প্রধান দেশসমূহ যখন স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন লড়াইয়ের পূর্ব্বে ষ্টার্লিঙের যে মূল্য ছিল ইংলণ্ড সেই মূল্যই গ্রহণ করিল। কিন্তু ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ স্বর্ণের পরিমাণ বা ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা কমাইয়া দিয়া তবে পুনরায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করিতে সাহসী হইল। মোট কথা, লড়াইয়ের পূর্ব্বে যে মূল্য ছিল তদপেক্ষা কেহই নিজ নিজ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি করেন নাই, বরং হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, লড়াইয়ের পূর্ব্বে ২৫ বৎসর কাল আমাদের টাকার মূল্য ছিল ১ শিলিং ৪ পেনি। লড়াইয়ের পর হঠাৎ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হইল একেবারে ২ শিলিং। তারপর ইহার ফলে ধন নিঃসরণ হইয়া ভারতের যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত হইল তখন ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইল ১ শিলিং ৬ পেনি। তথাপি লড়াইয়ের পূর্ব্বকার মূল্য অপেক্ষা ইহার মূল্য ২ পেনি বেশী ধরা হইয়াছে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, পূর্ব্বে মূল্য কম ছিল; ২ পেনি মূল্য বাড়াইয়া দিয়া টাকা ও ষ্টার্লিঙের মূল্যের মধ্যে সত্যকার সামঞ্জস্য করা হইয়াছে। এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারিতাম যদি বিজ্ঞানসম্মত অন্যরূপ বিপরীত প্রমাণ কিছু না থাকিত।

বিজ্ঞান-সম্মত বিচার করিতে হইলে উভয় দেশের পণ্যের মূল্য-তালিকার দিকে তাকাইতে হইবে। টাকা ও ষ্টার্লিঙের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট রেশিও যদি খাঁটি রেশিও হয়, তবে ইংলণ্ডে জিনিষের দর ষ্টার্লিঙের মূল্যের সহিত যেমন ওঠানামা করিবে, ভারতেও টাকার মূল্য এবং জিনিষের দর অনেকটা সেই অনুপাতে ওঠানামা করিবে।

কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ইংলণ্ডে জিনিষের দর কিছু চড়িয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে চড়া দূরের কথা, আরও খানিকটা নামিয়াছে। ভারতের ন্যায় সমাবস্থাবিশিষ্ট অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য কৃষি প্রধান দেশের মূল্য-তালিকার সহিত আমাদের মূল্য-তালিকার তুলনা করিলেও সেই একই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ঐ সকল দেশে জিনিষের দর বেশ খানিকটা চড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও এদেশে পণ্যের মূল্য হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি পায় নাই। এই সব দেশের লড়াইয়ের পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের মূল্য-তালিকার সহিত বর্ত্তমান মূল্য-তালিকা মিলাইলে দেখিত পাইব ইহাদের পণ্যের মূল্য আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম হ্রাস পাইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত হইবে না যে, আমাদের দেশের মুদ্রার আপেক্ষিক মূল্য নিরূপণ ঠিক হয় নাই এবং ষ্টার্লিঙের সহিত তুলনায় ইহার মূল্য অধিক ধরা হইয়াছে।

তাহার আরও একটা প্রমাণ দিতে পারা যায়। ১৯৩০ সালের পূর্ব্বেকার কয়েক বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভারতের রপ্তানি আমদানি অপেক্ষা প্রায় ৮৪।৮৫ কোটি টাকা বেশী ছিল। কিন্তু উহা পরবর্ত্তী তিন বৎসরে ক্রমান্বয়ে নামিয়া ১৯৩২-৩৩ সালের শেষে মাত্র ৪ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দার দোহাই দিয়া ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না। কারণ তাহাই যদি সত্য হইত, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের, বিশেষতঃ কৃষি প্রধান দেশের, বহির্বাণিজ্যেরও এরূপ অবনতি আমরা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু ঐ সব দেশের বাণিজ্য-হিসাব

পরীক্ষা করিলে তাহাদের রপ্তানির এতাদৃশ হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায় না। দুনিয়ার সাধারণ অবস্থাই যদি ইহার জন্য দায়ী হইত, তাহা হইলে যে পরিমাণ রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে, সেই পরিমাণ আমদানিও হ্রাস পাইত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে, বাট্টার হার অধিক হইলে তাহা কি প্রকারে দেশের রপ্তানিকে খর্ব্ব ও আমদানিকে সহায়তা দান করে। সেই জন্যই কোন দেশের বাণিজ্য-গতিকে (balance of trade) বৎসরের পর বৎসর অধিকতর প্রতিকূল হইতে দেখিলে আমরা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইতে পারি যে, ঐ দেশের মুদ্রার বহির্মূল্য অতিরিক্ত ধরা হইয়াছে।

অন্য প্রকার পরীক্ষা দ্বারাও আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব। ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, বেলজিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি দেশ আজও স্বর্ণমান আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।* সেই জন্যই উহাদের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস পাইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের রৌপ্যমুদ্রা ষ্টার্লিঙের সহিত যুক্ত থাকায় স্বর্ণমুদ্রার তুলনায় তাহার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাই বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে আমাদের আমদানি ও রপ্তানির হিসাব পৃথক করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ইটালী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশী পণ্যের আমদানি এদেশে যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি সেই পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। পক্ষান্তরে, ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি বিশ্বব্যবসায় একটু উন্নতি দেখা গেলে, প্রথমোক্ত দেশসমূহে আমাদের পণ্যের রপ্তানি যে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শেষোক্ত দেশসমূহে সে-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। ইহা হইতেও আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে ষ্টার্লিঙের তুলনায় আমাদের

---

* ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মুদ্রার মূল্য আরও কম হইলে ঐ সব দেশেও আমাদের রপ্তানি অন্যান্য দেশের মতই আরও অনেক বেশী হইতে পারিত এবং ঐ সব দেশ হইতে আমাদের দেশে বিদেশী পণ্যের আমদানিও অনেক হ্রাস পাইতে পারিত।

বহির্বাণিজ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের দেশের কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া যে কি পরিমাণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দুরবস্থা হইতেও হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছি। আমাদের দেশে কৃষকই প্রধানতঃ ধনোৎপাদন করে। কৃষকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ায় ডাক্তার, মোক্তার, ব্যবসাদার সকলেই আজ নিরুপায় হইয়াছেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরের গড় ধরিলে দেখা যায়, বাংলার কৃষিজাত পণ্যের বাজার দর ৭০ কোটি টাকার উপর ছিল। তন্মধ্যে বাংলার কৃষককে দেনা ও খাজনা ইত্যাদির বাবদ দিতে হয় ৩০ কোটি টাকার বেশী। তাহার মুনাফা থাকে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। কৃষক নিজের প্রয়োজনে যে পরিমাণ জিনিষ ব্যবহার করে এই হিসাবে তাহা ধরা হয় নাই। সেই স্থলে ১৯৩২-৩৩ সালে বাংলার কৃষক তাহার ফসলের মূল্য পাইয়াছে মাত্র ৩২ কোটি টাকা। অথচ তাহার দেনার পরিমাণ সেইরূপই আছে। অবস্থা কিরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা শুধু ইহা হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারিতেছি, কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উপর আমাদের শুভাশুভ কতটা নির্ভর করিতেছে। এই উদ্দেশ্যেই আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ডলারের মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছিলেন। আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকিলে আমরাও হয়ত তাহাই করিতাম। ইহাতে অন্য দেশকে আঘাত করিয়া নিজ দেশের স্বার্থকেই হয়ত বড় করিয়া দেখা হইত। কিন্তু সে রকম দাবী

আজ আমরা করিতেছি না। ভুল করিয়া যেটুকু মূল্য বেশী ধরা হইয়াছে এবং যাহার জন্য আমরা অন্যায় রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি শুধু সেইটুকু হইতে আজ আমরা মুক্তি প্রার্থনা করি। আমাদের দরবার—২ পেনির দরবার।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং আরও দুই চারজন বাঙালী ছাড়া সারা ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে দ্বিমত নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। অধ্যাপক সরকারের অভিমতে আমরা বিস্মিত হই নাই। সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যে তিনি সাধারণতঃ আস্থাবান নহেন। তিনি নূতন সত্যের সন্ধানী। তাঁহার পক্ষে নূতন কিছু বলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ব্যাপারে জনসম্মুখে আচার্য্য রায় মহাশয়ের মত লোকের অকস্মাৎ আবির্ভাবে আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে তাঁহাকে আমরা অনধিকারী বলিতে চাহি না। কারণ সকল বিষয়েই তাঁহার পড়াশুনা এবং অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাই বলিয়া যাঁহারা আজীবন এক্‌শ্চেঞ্জ, ক্রেডিট, ফাইন্যান্স লইয়া কাটাইলেন; যাঁহারা ইহা অবলম্বন করিয়াই যা-কিছু প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ জীবনে অর্জ্জন করিয়াছেন—তাঁহাদের এবং সকলের সমবেত অভিমতের বিরুদ্ধে এইরূপ উত্তেজনা ও উৎসাহ লইয়া তাঁহার এই আত্মপ্রকাশ অনেকটা হেঁয়ালির মতন ঠেকিতেছে। তাঁহার এই রুদ্র মূর্ত্তি সম্বরণ করিবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে কিনা শেষে স্বস্তিবচন পাঠাইতে হইল।

উহাদের বিরুদ্ধ মতের প্রত্যুত্তর যোগ্য ব্যক্তিরা যথাসময়ে যথাস্থানে দিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। উচ্চ রেশিওর স্বপক্ষে সাধারণতঃ যে দুই তিনটি যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে তাহাই সংক্ষেপে আমরা এখানে আলোচনা করিব।

আমরা দেখিয়াছি, বাট্টার হার উচ্চ হইলে বিদেশী জিনিষের দর সস্তা হয়। সুতরাং বাট্টার হার কমাইলে বিদেশী পণ্যের মূল্য চড়িয়া যাইবে, গরীব কৃষককুল ও জনসাধারণ এতটা সস্তায় আর জিনিষ কিনিতে পারিবে না, ইহা প্রতিপক্ষের একটি আপত্তি। কথাটা আপাততঃ বেশ ভাল শোনায়। কিন্তু গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়া যে রকম, কৃষকের ক্রয়শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়া তারপর তাহার সম্মুখে সস্তা বিদেশী জিনিষ উপস্থিত করাও প্রায় সেই রকম। যেখানে কেবল বাংলার কৃষকদের হাতে পূর্ব্বে ৪০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত, সেখানে তিন চার কোটি টাকাও আর আজ তাহাদের হাতে থাকে না। জিনিষের দর অসম্ভব রকম সস্তা হইলেও তাহারা আজ আর কিছু কিনিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান সমস্যার প্রধান লক্ষণই এই যে, পৃথিবীতে কোন জিনিষের আজ অভাব নাই, চারিদিকে কল্পনাতীত পণ্য-সম্ভারের আয়োজন, বিলাসসামগ্রীর ছড়াছড়ি; কিন্তু ক্রয় করিবার শক্তি আজ কাহারও আর তেমন নাই। Water, water, everywhere, but not a drop to drink. এই সস্তার হাটে আমাদের কৃষক বিদেশী সৌখিন বা প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছু ক্রয় করিতে পারিতেছে কি? চড়াবাজারে সে যাহা কিনিতে পারিয়াছিল আজ তাহা ক্রয় করা তাহার কল্পনার অতীত।

এখানে আরও একটা কথা ভাবিবার আছে। সস্তা বিদেশী জিনিষের লোভে দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি এবং দেশের স্থায়ী মঙ্গলকে প্রতিহত করা উচিত কি না? অন্য কোন দেশ তাহা হইতে দেয় নাই। সেই জন্য তাহারা দিনের পর দিন শুল্কপ্রাচীর উচ্চতর, মুদ্রামূল্য ন্যূনতর করিয়া বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রতিরোধ করিবার

মত্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। জাতিতে জাতিতে বিরোধ আজ সেই জন্য দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিপক্ষের আর একটি যুক্তি এই, বাংলা শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে এক প্রকার নূতন ব্রতী ; তাহার এই নবীন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার সময় বস্ত্র, চিনি ও অন্যান্য কারখানার জন্য অনেক কলকব্জার প্রয়োজন। বাট্টার হার কমাইলে বিদেশ হইতে আমদানী কলকব্জা, যন্ত্রপাতির মূল্য চড়িয়া যাইবে। কয়টি কারখানার প্রয়োজনীয় কলকব্জার মূল্যের দরুণ আমাদিগকে যে টাকাটা অধিক দিতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় আমরা অন্তর ও বহির্বাণিজ্যের বিস্তর উন্নতি হেতু যে টাকাটা পাইব, এই উভয়ের তুলনা করিলেই এই যুক্তির অসারতা বুঝিতে পারা যাইবে। যাঁহারা লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কলকব্জা আনাইতে পারিবেন, তাঁহারা 'রেশিও'র ২ পেনি পার্থক্যের দরুণ শতকরা ১২॥০ হিসাবে * ১২৫০০৲ টাকাও বেশী দিতে পারিবেন। যদি ধরা যায় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর নূতন ইন্‌ডাষ্ট্রীর জন্য এক কোটি টাকার কলকব্জা বিদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য আমাদিগকে ১২॥০ লক্ষ টাকা অধিক দিতে হইবে। অথচ অন্য দিক দিয়া আমরা লাভবান হইব বহু কোটি টাকার।

তা ছাড়া এ সম্পর্কে আরও একটা দিক বিবেচনা করিবার আছে। বর্ত্তমান রেশিও যদি স্থির রাখা হয়, তাহা হইলে শুধু বিদেশী কলকব্জা কেন, বিদেশ হইতে আমদানী সব জিনিষের মূল্য শতকরা ১২॥০ টাকা কম পড়িবে। ফলে যন্ত্রপাতি সস্তা পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু ঐ যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তুত পণ্যের মূল্য বিদেশী পণ্যের তুলনায় ১২॥০ টাকা

---

* ১০০×২ পেনি=২০০ পেনি। ২০০÷১৬=১২॥০ টাকা।

শতকরা বেশী পড়িবে। এককালীন কলকব্জার জন্য শতকরা ১২॥০ টাকা বেশী দেওয়া অপেক্ষা সেই কলকব্জা হইতে প্রস্তুত পণ্যের উপর দিনের পর দিন ১২॥০ টাকা বেশী দেওয়া নিশ্চয়ই অধিকতর ক্ষতিকর। মূল্যের এতটা পার্থক্যের দরুণ ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় বাজারে টিকিয়া থাকিতেই হয়ত পারিবে না এবং কারখানাটিও মূলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

প্রতিপক্ষের তৃতীয় যুক্তিটি অধিকতর সারবান বলিয়া মনে হয়। বাট্টার হার ২ পেনি কমাইয়া দিলে ইংলণ্ডকে ‘হোম চার্জ্জেস’ দরুণ আমাদের বাৎসরিক যে দক্ষিণা দিতে হয় তাহা বৃদ্ধি পাইবে। দক্ষিণার পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ৩॥০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ প্রায় ৪৬½ কোটি টাকা। টাকার মূল্য ২ পেনি হ্রাস পাইলে এই বাবদ আমাদিগকে শতকরা ১২॥০ হিসাবে আনুমানিক ৫¾ কোটি টাকা আরও বেশী দিতে হইবে ইহা সত্য। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ কোটি টাকা। টাকার মূল্য ২ পেনি কমিলে তাহার ঋণভারও শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে একশত কোটি টাকা লাঘব হইবে। কৃষিপ্রধান কৃষিসম্বল ভারতের হিতাহিত বিচার করিতে হইলে, এই অসহায় মূক জীবদের কথা ভুলিলে চলিবে না। ইহা ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, আয়কর, শুল্ককর ইত্যাদি বাবদ সরকারী আয় অনেক বৃদ্ধি পাইবে; সুতরাং ‘হোম চার্জ্জেস’ বাবদ যে পাঁচ-ছয় কোটি টাকা আমাদিগকে অতিরিক্ত দিতে হইবে তাহা গায়ে লাগিবে না; বরং সাধারণ অবস্থার উন্নতির ফলে আমাদের মঙ্গলই হইবে।

ইংলণ্ডের নিকট আমাদের বহু টাকা ধার; যাহাকে ইংরাজীতে debtor country বলে আমাদের অবস্থাও তাই। বিদেশে মাল রপ্তানি

করিয়া তাহার মূল্য হইতে আমাদের দেনা পরিশোধ করিতে হয়। রপ্তানি পড়িয়া গিয়া বাণিজ্যের গতি যদি আমাদের প্রতিকূল দাঁড়ায়, তাহা হইলে ঋণ দিবার জন্য সঞ্চিত তহবিল ভাঙ্গা ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় থাকে না। সেই জন্যই গত কয়েক বৎসরে আমাদের দেশ হইতে জাহাজ বোঝাই হইয়া ৩০০ কোটি টাকার অধিক স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে। কিন্তু এ ভাবে কতদিন চলিবে? তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যবস্থা পরিষদে রাজস্ব-সচিব যখন নূতন বিল উপস্থিত করিলেন, তখন ১ শিলিং ৬ পেনি স্থলে ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও নির্দ্ধারণ জন্য পুনরায় আন্দোলন সুরু হয়। অন্ততঃ বর্ত্তমান রেশিও ঐ বিলে কায়েম না করিয়া দেশের অবস্থানুযায়ী মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার ঐ ব্যাঙ্কের উপর দেওয়া হউক, ইহাও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া ষ্টার্লিং ও টাকার রেশিও পূর্ব্ববৎ ১ শিলিং ৬ পেনি পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন দেশের মুদ্রার মূল্য এভাবে পাকাপাকি কবিয়া বাঁধা নাই। আর্থিক জগতের কতকগুলি অবস্থার উপর তাহা কমিতেছে বাড়িতেছে। আমরা দেখিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিবার চেষ্টা দেশে দেশে চলিয়াছে এবং প্রত্যহ ডলার, ষ্টার্লিং, ইয়েন প্রভৃতি মুদ্রার রেশিও স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কেবল আমরাই আইনের নাগপাশে বাঁধা পড়িয়াছি। এই বাঁধন হইতে ছাড়া পাইলেই আমাদের টাকার স্বাভাবিক ও প্রকৃত মূল্য ধরা পড়িত। কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই; কারণ মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আর্থিক জগতে যে দুর্দ্দৈব দেখা দিয়াছে তাহা কাটিবার কোন লক্ষণই বিশেষ দেখা যাইতেছে না। কোথা হইতে কি করিয়া এই বিশ্বব্যাপী অনর্থের সূত্রপাত হইল তাহা কেহই বড় ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; কিন্তু অসীম ধৈর্য্যের সহিত আশা করিয়া আছেন, স্বর্গের কিংবা মর্ত্ত্যের অধিপতিরা শীঘ্রই ইহার একটা প্রতিকার করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মর্ত্ত্যের দেবতারাও হালে পানি পাইতেছেন না, স্বর্গের দেবতাও বিমুখ। বিকল যন্ত্রটাকে লইয়া নানারূপ কারসাজি চলিয়াছে, মাঝে মাঝে যন্ত্রটা একটু নড়িয়া-চড়িয়াও উঠিতেছে, কিন্তু তার প্রাণের স্পন্দন বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না।* মানুষের দুঃখ যখন দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহা লইয়া নিজেদের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেও সাময়িক আত্মবিস্মৃতি ঘটিতে পারে।

রোগের কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হইলেও একথা ঠিক যে পূর্ব্বকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে খাদ্যশস্য ধ্বংস হইয়া যে অভাব-অনটন বা দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইত, ইহা তাহা নহে। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব হইতে এই সঙ্কটের উদ্ভব হয় নাই। মানুষের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা বা সংগঠনশক্তি যে অপূর্ব্ব শিল্পসম্ভারের জন্মদান করিয়াছে, তাহার অভাব হইতেও এই সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই। এ সঙ্কট বস্তুজগতে প্রাচুর্য্যের সঙ্কট—অভাবের সঙ্কট নহে। তবে কি বুঝিতে হইবে সমগ্র পৃথিবীর অভাব আজ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে? মানব মাত্রেরই কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আজ আর

---

* বিশ্বময় যুদ্ধভীতির ফলে ইউরোপে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে এবং তদ্দরুণ জিনিষের চাহিদা ও দর এখন কিছু দিন যাবৎ আবার একটু চড়তির পথে। কিন্তু ইহাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা বলা চলে না।

অপূর্ণ নাই—ভোগ তাহার আজ আকণ্ঠ হইয়াছে? তাহাও ত সত্য নহে। প্রকৃতির দানে কার্পণ্য ঘটে নাই, মানুষের সৃষ্টি তেমনি অবিরাম চলিয়াছে ইহা যেমন সত্য, সকল রকমে বঞ্চিত নিঃস্বের অসদ্ভাবও পৃথিবীতে কিছু মাত্র ঘটে নাই, ইহাও তেমনই সত্য। বিশ্ব-অধিবাসীর এক পঞ্চমাংশ ভারতীয়দের দিকে তাকাইলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। এক জন ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন—"Human demand is illimitable and will be, until the last Hottentot lives like a millionaire." "মানুষের চাহিদা অসীম, এবং যতদিন পর্য্যন্ত না শেষ হটেণ্টট ক্রোড়পতির মত চা'লে জীবন যাপন করে ততদিন অসীম থাকিবে।"

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, মানুষের অভাব পূর্ণ হয় নাই এবং অকস্মাৎ স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব না হইলে, সে অভাব পূরণ হইতে এখনও সম্ভবতঃ বহু যুগের আবশ্যক। অথচ অন্য দিকে পণ্যসম্ভার আজ শিল্পী ও বণিকের কাঁধে ভূতের বোঝার মত চাপিয়া বসিয়াছে—মানুষের ভোগে তাহা আসিতে পারিতেছে না। ভোজ্য প্রচুর, বুভুক্ষুও সংখ্যাতীত। বুঝিতে পারা যাইতেছে, কোন কারণে দুইয়ের যোগসূত্রের বিচ্ছেদেই এই প্রাণান্তকর নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। যে ব্যবস্থা ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি ও স্বার্থ মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উভয়ের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, তাহার ভিতরে কোন ছিদ্রপথে আজ ঘুণ ধরিয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হিসাব লইলে দেখা যাইবে যে ১৯২৯ সালের পর এই দুর্দ্দিনের সুরু হইতে, পণ্য ও শিল্পের উৎপাদন

পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের মূল্যও অত্যধিক হ্রাস পাইয়াছে; অথচ পৃথিবীর লোকসংখ্যা ও বিবিধ জিনিষের প্রয়োজন, বৃদ্ধি পাইয়াছে ভিন্ন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন পণ্যের আধিক্য হেতু এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে আমাদের এই অনুমান ঠিক নহে বুঝিতে হইবে।

কাঁচা মাল বা তৈরী জিনিষ, কাহারও আজ আর যথেষ্ট চাহিদা নাই, ইহাই হইল বর্ত্তমান দুর্গতির গোড়ার কথা। ইহার মূলে রহিয়াছে যে-মূল্যে ক্রেতাগণ ক্রয় করিতে সমর্থ এবং যে-মূল্যে বিক্রেতা ক্ষতি স্বীকার না করিয়া বিক্রয় করিতে সমর্থ, এই দুই ক্ষমতার তারতম্য। কোন জিনিষের প্রয়োজন থাকা ও বাজারে তাহার চাহিদা থাকা এক জিনিষ নহে। প্রয়োজন বা সখ আমাদের বহু জিনিষেরই আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সব প্রয়োজন বা সখ মিটাইবার শক্তি আমাদের সকলের আছে কি? প্রয়োজন তখনই চাহিদায় পরিণত হয় যখন মূল্যদ্বারা প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিবার শক্তি আমরা অর্জ্জন করি। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জিনিষের চাহিদা নির্ভর করে দুইটি জিনিষের উপর—প্রথমতঃ, তাহার প্রয়োজনীয়তা; দ্বিতীয়তঃ, তাহার মূল্য। মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ সম্বন্ধে কারখানার মালিক যদি ঠিক অনুমান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পণ্যদ্রব্য লইয়া যেমন গুরুতর অবস্থায় পড়িতে হইবে, অর্থনীতির মারপ্যাঁচে জিনিষের মূল্যহ্রাস ঘটিলেও তাঁহাকে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অর্থনীতির সহিত মূল্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে এখানে আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। অর্থের পরিমাণ বিভিন্ন দেশের অর্থ-নৈতিক ও অন্যান্য নানা কারণে কমিতেছে বাড়িতেছে। কোন দেশে চল্‌তি অর্থের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অর্থসমষ্টির সঙ্কোচন (deflation)

ঘটিলে, যোগান ও চাহিদার সাধারণ নিয়মানুযায়ী অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে; অর্থাৎ জিনিষের মূল্য হ্রাস পাইবে। পক্ষান্তরে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত (inflation) হইলে অর্থের মূল্য কমিবে অর্থাৎ জিনিষের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

অনেকে মনে করেন পণ্যবিনিময়ের বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে মুদ্রার আবির্ভাব এবং একাধিপত্য এই গুরুতর সমস্যার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। সেই জন্য একদল নূতন পন্থী পণ্যের হাট হইতে এই খামখেয়ালি মধ্যবর্ত্তী প্রভুটিকে বাদ দিয়া পণ্যের সহিত পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া আদিকালের ব্যবস্থাকে ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। বিভিন্ন দেশের মুদ্রানীতি বর্ত্তমান সমস্যাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা অন্যান্য কারণগুলির অনুসন্ধান করিতে চাই।

দেহরক্ষা ও প্রাণধারণের উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়টি জিনিষ বাদ দিলে সুখস্বচ্ছন্দতা বা আরামের জন্য আজ মানুষের যে অসংখ্য প্রকার বিলাস-সামগ্রীর প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্রুত উন্নতির ফলে একই শ্রেণীর জিনিষ নিত্য নূতন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রেতাদিগকে বিভ্রান্ত ও বহুবিভক্ত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের পছন্দ বা সখের আজ আর অন্ত নাই। হালফ্যাশানরূপে আজ যাহা সাগ্রহে গৃহীত হইতেছে, কাল তাহা পুরাতন ও সেকেলে হিসাবে পরিত্যক্ত হইতেছে। অস্থিরমতি ক্রেতার এই দৌরাত্ম্য বর্ত্তমান যুগের কারখানার মালিকগণের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কারিকরের সংখ্যা ছিল বহু ও বিস্তৃত এবং শক্তি ছিল কম। বাজারের অবস্থা বুঝিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অবস্থা তাহারা সহজেই সময়োপযোগী করিয়া লইতে পারিত।

এক্ষণে এক একটি জিনিষ প্রস্তুতের জন্য এক একটি বিশাল যৌথকারবারের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার বিরাট আয়োজন। একই ছাঁদে একই জিনিষ তাহার উদর হইতে বাহির হইতেছে শতে শতে বা সহস্রে সহস্রে। নূতন ফ্যাসান, নূতন গড়ন একটি চলতি জিনিষকে বাতিল করিয়া দিলে, নূতন অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়ান এই সব বৃহৎ পাকা ইমারত ও ঢালাই লৌহ-ইস্পাতের পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় সহজসাধ্য হয় না। ব্যবসাক্ষেত্রে এমনি একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহাতে একটা বড় কারখানার অবস্থা কাহিল হইলে তাহার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। বাংলার চাষীর অবস্থা হীন হওয়ায় তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পারিতেছে না এবং ফলে বিলাতি ও দেশী কাপড়ের কলের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। এখানেই শেষ নহে—কলওয়ালাদের তুলার প্রয়োজন পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতের ও আমেরিকার তুলার ব্যবসায়ীর অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কাপড়ের কলের কারিকর ও মজুরদের অবস্থা হীন হওয়ায় খরচ সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে হাত গুটাইতে হইয়াছে। ফলে যে-সব ব্যবসায়ী তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া লাভবান হইতেছিল তাহাদের ব্যবসায় ভাটা পড়িতে সুরু করিয়াছে। এক মাত্র পাটের মূল্য হ্রাস হইতে যে অবস্থার প্রথম সূচনা হইয়াছিল তাহার শেষ পরিণতি কোথায় তাহা বলা কঠিন। এক স্থানের জের আজ সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কারণ দেশকালের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া সারা দুনিয়া আজ এক হাটে মিলিয়াছে। ব্যবসা-জগতে একের অন্যকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া চলিবার উপায় আর নাই।

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটকে অনেকেই ট্রেড সাইকেল (trade cycle) এরই একটা সাধারণ পর্য্যায় মাত্র মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা এতদিনে ঘুচিয়াছে। অবশ্য একথা কেহ অস্বীকার করেন না যে, ব্যবসাজগতেরও একটা ভাগ্যচক্র আছে এবং তাহা পর্য্যায়ক্রমে উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। উন্নতির পর অবনতি এখানকারও স্বাভাবিক নিয়ম। কোন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ও অর্থাগম আরম্ভ হইলেই ব্যবসায়িগণ অধিক লাভের আশায় অতিরিক্ত মাল প্রস্তুত করিয়া বাজারে ছাড়িতে সুরু করেন। ফলে মূল্য হ্রাস ঘটিয়া লাভের ঘরে শূন্য পড়িতে থাকে এবং নূতন ব্যবসা-বাণিজ্য পত্তন ও অর্থব্যয়ের সব পথ রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ অবস্থা আসিলে অবিক্রীত মাল যে-কোন মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। তখন আবার জিনিষের চাহিদা স্বল্পমূল্যতার দরুণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া ব্যবসা-জগতে নূতন প্রাণ সঞ্চারের সৃষ্টি করে। ইহারই নাম ট্রেড সাইকেল। কতকগুলি লোকের দূরদর্শিতার অভাব, উৎপন্ন পণ্যের আধিক্য ইত্যাদি সাধারণ কারণে মাঝে মাঝে এরূপ অবসাদ ব্যবসা-জগতে আসিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান অবসাদের গুরুত্ব ও বিস্তৃতি যেমন অননুভূতপূর্ব্ব, ইহার বৈশিষ্ট্যও তেমনই অসাধারণ; কারণ পণ্যের অভাবনীয়রূপে মূল্যহ্রাস সত্ত্বেও বিশ্বের হাটে মালের চাহিদা তেমন বাড়িতে পারিতেছে না।

অনেকে মনে করেন অর্থনৈতিক ও বিগত যুদ্ধঘটিত কারণ ব্যতিরেকেও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য ও কৃষকের অবস্থার অধোগতি অনিবার্য্য ছিল। শিল্পজাত পণ্যের প্রয়োজনীয়তার শেষ নাই সত্য; কিন্তু কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নহে; কারণ মানুষের হজম শক্তির একটা সীমা আছে; তাই ভোজনের রকমারি বৃদ্ধি পাইলেও

প্রত্যেক জিনিষের পরিমাণ কমিয়াছে। যানবাহন ও চাষাবাদের জন্য গরু ও ঘোড়ার স্থান মোটর অধিকার করায় গরু-ঘোড়ার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হইত তাহারও আর প্রয়োজন হইতেছে না। কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের কল্যাণে ভাল সার ও উন্নত প্রণালীতে চাষ-আবাদ হইয়া প্রতি একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব কারণে অনেকে মনে করেন সর্ব্বক্ষেত্রে আজ যে অবসাদ দেখা যাইতেছে তাহার গোড়ায় রহিয়াছে কৃষি ও কৃষকের দুরবস্থা। সেখান হইতেই বর্ত্তমান দুর্গতির সূত্রপাত।

তার উপর বিগত লড়াই চারিদিকে বাধানিষেধের সৃষ্টি করিয়া মাল-সরবরাহের সাধারণ ব্যবস্থাকে একেবারে ওলট-পালট করিয়া দেয়। যুদ্ধে নিরত দেশসমূহ বিভিন্ন দেশে খাদ্যশস্য বা সেই সময়কার প্রয়োজনীয় সকল জিনিষের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয়। অন্যদিকে অবরোধ (blockade) নীতিও চলিতে থাকে। রুশিয়ার গম বাহিরে যাইতে না পারায় আমেরিকা তাহার গমের চাষ এই সুযোগে খুব বৃদ্ধি করিয়া ফেলে। যুদ্ধের অবসানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রয়োজন অপেক্ষা গমের সরবরাহ অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষ এবং জাপান লড়াইয়ের সময়ে তাহাদের কাপড়ের কল যথাসাধ্য বাড়াইয়া ফেলিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বাজার অধিকার করিয়া ফেলিল। লড়াই অন্তে ল্যাঙ্কাশায়ারের কল যখন পুরা দমে চলিতে সুরু করিল. তখন সকল কলওয়ালারই হইল ফ্যাসাদ। যুদ্ধের সময় জিনিষের আমদানি বা রপ্তানি কষ্টসাধ্য হওয়ায় প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি ও সরবরাহের ব্যবস্থা নিজ দেশের মধ্যেই করিয়া লইতে বাধ্য হয়। কাজেই যুদ্ধশেষে আমদানি-রপ্তানি পুনরায় আরম্ভ হইলে জিনিষের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতে থাকে। আয়োজনের

সহিত প্রয়োজনের, কৃষির সহিত শিল্পের এই আকস্মিক বৈষম্য বিগত যুদ্ধেরই অপর পরিণাম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে পঙ্গু করিবার অন্যতম কারণ।

এই ত গেল পণ্যের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কীয় সমস্যা—একের অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থা; অপরের খামখেয়ালি। যোগান ও চাহিদার মধ্যে যে জিনিষটি সার পদার্থ, মধ্যস্থ হইয়া যিনি উভয়ের সংযোগ সংঘটন করেন, সেই সকল অনর্থের গোড়া অর্থ সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা আর একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। আমাকে স্থির চিত্তে কাজ করিতে হইলে আমার পূর্ব্বাহ্নে জানা দরকার, যে-মধ্যস্থ মাপকাঠির সাহায্যে আমার পণ্যের দর নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহার মাপ বা মূল্য ঠিক আছে এবং ভবিষ্যতেও ঠিক থাকিবে। ষোল গিরার মাপে গজ হিসাব করিয়া পাইকারী দরে কলিকাতা হইতে কাপড় কিনিয়া আনিলাম পল্লীর হাটে খুচরা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইব। কিন্তু মাল পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে গজের মাপ যদি ষোল গিরার স্থলে বত্রিশ গিরা নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে লাভের ঘরে আমাকে নিশ্চয়ই সর্ষেফুল দেখিতে হয়। যে অর্থকে মধ্যস্থ রাখিয়া আমরা বেচাকেনার কাজ করি, লাভ ক্ষতি নির্ণয় করি, তাহার মূল্যই যদি পরিবর্ত্তনশীল হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বলিতে হয়, "বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথা?" অর্থ বলিতে আধুনিক যুগে আমরা শুধু রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা বুঝিব না; কারেন্সি নোট, চেক্, ড্রাফ্ট্, বিল, মায় ধার করিবার মর্য্যাদা (যাহাকে ইংরাজিতে ক্রেডিট বলা হয়) এই সবই আজ অর্থপর্য্যায়ভুক্ত। আমার হাতে টাকা নাই, কিন্তু বাজারে মর্য্যাদা (credit) আছে। আমি লক্ষ টাকার মাল ধারে ক্রয় করিতে পারি। এখানে অর্থের প্রয়োজন আমি নিজপ্রতিপত্তির দ্বারা মিটাইয়া লইতে সমর্থ হইতেছি। লক্ষ টাকা পুঁজি

লইয়া দু-চার লক্ষ টাকার কারবার হর্‌দম্ চলিয়াছে বর্ত্তমান দুনিয়ায়। তাই অর্থশাস্ত্রে ক্রেডিটও আজ টাকার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এই ক্রেডিটের পরিমাপ করা চলে না। এই সব কারণে দেশবিশেষের বা দুনিয়ার অর্থের পরিমাণ একেবারেই স্থির রাখিতে পারা যাইতেছে না। শুধু ধাতব মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্ট-প্রচলিত নোট ভিন্ন অর্থের প্রয়োজন অন্য কোন ভাবে মিটাইবার উপায় না থাকিলে এবং বহির্জ্জগতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সকল প্রকার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিলে, কোন দেশের অর্থের পরিমাণ হয়ত অনেকটা স্থির রাখিতে পারা যাইত। কিন্তু বিশ্বের হাট আজ ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের কাছে তাহার দিবার ও নিবার আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার মূল্য যেমন পাইতেছি তেমনি দিতেছি। এই সব আন্তর্জ্জাতিক লেনাদেনার ভিতর দিয়া দেশের অর্থভাণ্ডার অবিরত বাড়িতেছে কমিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের মূল্যও স্থির থাকিতেছে না। আর একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। ধরা যাক্, বাজারে পাঁচটি রোহিত মৎস্য আসিয়াছে; এবং সমবেত ক্রেতাদের পকেটে মোট পঁচিশটি টাকা আছে। এ অবস্থায় একটি মাছের দর ৫৲ টাকার বেশী হইবার উপায় নাই। মৎস্য-ব্যবসায়ীকে অগত্যা এই মূল্যেই তাহার মাছ বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু ২৫৲ টাকার স্থলে যদি হাটের ক্রেতাদের নিকট ৩০৲ টাকা থাকিত, তাহা হইলে ৬৲ টাকা দরেও মাছগুলি বিক্রয় হইতে পারিত। পক্ষান্তরে ক্রেতাদের নিকট ২০৲ টাকার বেশী না থাকিলে বিক্রেতাকে ৪৲ টাকা মূল্যেই মাছগুলি বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিতে হইত। টাকার পরিমাণের উপর জিনিষের দর কি ভাবে নির্ভর করে ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিব।

অর্থনীতির মারপ্যাঁচ ব্যতিরেকেও জিনিষের মূল্য যে হ্রাসবৃদ্ধি পাইতে

পারে এখানে সে কথাটাও আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির সহিত অবশ্য বর্ত্তমান সমস্যার কোনরূপ যোগাযোগ নাই এবং ইহা অন্যায় রকমে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতিও করে না। শিল্পীর চেষ্টা ও বিবেচনার ফলে কোন পণ্য প্রস্তুত করিবার ব্যয় হ্রাস পাইতে পারে; কোন নূতন আবিষ্কারের কল্যাণে শ্রমের লাঘব হইয়াও খরচের সাশ্রয় হইতে পারে। বুদ্ধি বা কর্ম্মের যোগ্যতার দরুণ এইরূপ মূল্য-হ্রাস ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে অনিষ্টকর ত নহেই, বরঞ্চ স্বাস্থ্যকর—কারণ, অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তির নড়চড় না হইয়া জিনিষের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক নিয়মে তাহার চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শিল্পোন্নতির ইহাই সত্যকার পরীক্ষা। এ-ভাবে মূল্য হ্রাস জিনিষ-বিশেষের ক্ষেত্রেই ঘটিতে পারে—সকল জিনিষের বেলায় কখনও এ-ভাবে একসঙ্গে মূল্য-হ্রাস সম্ভবপর নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যার মূলে জিনিষ মাত্রেরই অসম্ভব রকমের মূল্য-হ্রাস আমরা দেখিতে পাই। ইহা উল্লিখিত যোগ্যতার স্বাভাবিক পুরস্কার নহে, অর্থনৈতিক কারণের অস্বাভাবিক পরিণাম। ইহার মূলে রহিয়াছে পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কোচন বা currency deflation. এখানে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ভূয়োদর্শিতা ও যোগ্যতা দ্বারা জিনিষের তৈরি-খরচ কমাইয়া কোনই লাভ নাই—যদি মুদ্রা-মূল্য আমরা স্থির রাখিতে না পারি। কারণ মুদ্রা-মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইলে জিনিষের দর আপনিই চড়িয়া যাইবে এবং কারিকর তাহার যোগ্যতার ন্যায্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত হইবে।

লড়াইয়ের জীবন-মরণ সমস্যার সময় অর্থের প্রয়োজন হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বর্ণমুদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে নিজ নিজ দেশে অত্যধিক পরিমাণে কাগজের নোট চালাইতে সুরু করিলেন। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকার কাজকর্ম্ম নিজেদের মধ্যে ধারে চলিতে লাগিল। এইরূপে

পৃথিবীর অর্থ-তহবিলকে অস্বাভাবিকরূপে জোর করিয়া অত্যন্ত ফাঁপাইয়া তোলা হইল। ফলে লড়াইয়ের সময় জিনিষের দর কল্পনাতীত বৃদ্ধি পাইয়া গেল। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে সকল দেশই যখন স্বর্ণমান পুনরায় প্রচলন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সকল জিনিষের মূল্যের উপরই হঠাৎ একটা গুরুতর চাপ পড়িল। ঘোর দুর্দ্দিনে যে 'মেকি' মুদ্রা ও মর্য্যাদাকে একপ্রকার জোর করিয়া চালান হইয়াছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল এবং মুদ্রা-তহবিলের স্ফীতি অকস্মাৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল—সঙ্গে সঙ্গে জিনিষের দরও চারিদিকে একেবারে পড়িয়া গেল। বর্ত্তমান ব্যবসামন্দার মূলে মুদ্রানীতির অদৃশ্য হস্ত যে অনেকখানি দায়ী তৎসম্বন্ধে আর ভুল নাই। নরমেধ-যজ্ঞের উদ্‌যাপন সফল করিবার জন্য যাঁহারা ভূয়া অর্থ সৃষ্টি করিয়া মানুষের অর্থ-লালসাকে অসম্ভব রকম বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন, যুদ্ধের শেষে এক কলমের খোঁচায় তাঁহারা সেই 'মেকি' অর্থের অন্তর্দ্ধান ঘটাইলেন বটে, কিন্তু মানুষের দুরাশাকে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কারিকর, মজুর হইতে সুরু করিয়া উপরওয়ালা সকলেই লড়াইয়ের সময়কার মজুরী ও লাভ দাবি করিতে ছাড়িলেন না; কিন্তু সেই দাবি মিটাইবার জন্য তহবিলে আর তখন অর্থ নাই। জিনিষের তৈরি খরচ কমিতে চাহিল না, অথচ ক্রেতার ক্রয়শক্তি হ্রাস পাইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে বৈষম্যের ইহাও অন্যতম প্রধান কারণ।

অর্থশাস্ত্রের সঙ্কোচন বা প্রসারণ নীতির ফলে মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে আর্থিক জগতে তাহার অপর কি পরিণাম হইতে পারে তৎসম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। রামের নিকট আমি যখন টাকা ধার করি তখন টাকার যে মূল্য বা ক্রয়শক্তি ছিল এক্ষণে তাহা যদি কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে আমার

দেনা আপনা হইতে অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। কি প্রকারে, বলিতেছি। ধরা যাক্—আমি যখন টাকা ধার করিয়াছিলাম, তখন এক মণ চালের দর ছিল ৫৲ টাকা। এক্ষণে টাকার ক্রয়শক্তি অর্দ্ধেক হ্রাস পাইয়া সকল জিনিষের মূল্যই দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এক মণ চালের মূল্য ১০৲ টাকা এবং আধ মণ চালের মূল্য ৫৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। যে ৫৲ টাকা ধার করিয়া আমি এক মণ চাল কিনিয়াছিলাম, সেই ৫৲ টাকা যখন বন্ধুকে আমি ফিরাইয়া দিলাম, তখন তিনি তাহা দ্বারা আধ মণের বেশী চাল আর খরিদ করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার অর্দ্ধেক টাকা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া তাঁহার দেনদারের পকেটে আশ্রয় লইয়াছে। মানুষের টাকার প্রয়োজন টাকার জন্য নহে, তাহার সাহায্যে তাহার অন্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। কর্ম্মক্ষেত্রে বা ব্যবসাক্ষেত্রে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক দেনা-পাওনা লইয়া। অপরের নিকট আমার যেমন টাকা প্রাপ্য আছে তেমনই আবার অপরেও আমার নিকট টাকা পাইবে। কিন্তু মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এই দেনা-পাওনা স্থির থাকে না এবং নিতান্ত অকারণে একজনের পাওনা বাড়িয়া দেনা কমিয়া যায় কিংবা দেনা বাড়িয়া পাওনা কমিয়া যায়। এইরূপে অর্থ যখন অন্যায় রকমে হাত বদ্‌লায় তখন নূতন ধনী নূতন পছন্দ ও নূতন দাবি লইয়া বাজারে উপস্থিত হয় এবং দোকানদার তাহার পুরাতন অভিজ্ঞতা ও আয়োজন লইয়া একেবারে বোকা বনিয়া যায়। ইহাও ব্যবসাজগতে বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ মনে করা যাইতে পারে।

একটি দুর্গতি অপর দুর্গতিকে আহ্বান করিয়া আনে ; দেহের একটি অংশ বিকল হইলে তাহার অপর অংশও ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। জিনিষের কাটতি পড়িয়া গিয়া

ব্যবসা মন্দার সৃষ্টি হইতেই মানুষের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। দোকানে বা গুদামে মাল পড়িয়া আছে, কিন্তু হাতে অর্থ নাই। কাজেই মহাজন তাহার পাওনার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং ধারে কাজ করিতে কেহই আর ভরসা পাইতেছে না। চারিদিকে কেমন একটা অবিশ্বাস ও অনাস্থা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাঁহার কিছু টাকা আছে তিনি সে টাকা আর হাতছাড়া করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহাতে নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়া বেকার-সমস্যার গুরুত্ব যেমন বাড়িতেছে, কেনাবেচা আরও কমিয়া গিয়া চলতি ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অন্য সব-কিছুতে আস্থা হারাইয়া লোকে শুধু নগদ টাকা পুঁজি করিতে ব্যস্ত হইয়াছে এবং এই মনোবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষকে ছাড়াইয়া প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছে। ফলে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই বিদেশে মাল চালান করিয়া নিজ দেশে অর্থাগমের জন্য যেমন এক দিকে ব্যস্ত, অন্য দিকে বিদেশ হইতে মাল আমদানি হইয়া দেশের অর্থ যাহাতে বাহিরে চলিয়া যাইতে না-পারে তাহার জন্যও তেমনই উৎকণ্ঠিত। আপাত দৃষ্টিতে ইহা ভালই মনে হইতে পারে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে প্রত্যেক দেশই যদি এই পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাই বা চলিবে কিরূপে? আর যে উদ্দেশ্যে এই পথ অবলম্বন করা তাহাই বা সিদ্ধ হইবে কেমন করিয়া? যেখানে সব সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, সেখানে এ-পথ যে আত্মরক্ষার পথ নহে, এ-পথে পরের যাত্রা ভঙ্গ হইলেও নিজের নাককানও যে আস্ত থাকিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

অপরের ব্যবসা নষ্ট করিয়া নিজের ব্যবসা প্রসারের এই ব্যর্থ চেষ্টা চলে দুই উপায়ে। প্রথমতঃ, বিদেশী জিনিষের উপর উচ্চ শুল্ক বসাইয়া

উহার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা ; দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশের কারখানাকে অর্থসাহায্য করিয়া অর্থাৎ subsidy দিয়া নিজেদের অক্ষম প্রচেষ্টাকে বিদেশী প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা। ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রগতি ব্যাহত হইতেছে। উচ্চ শুল্ক-প্রাচীরের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য যদি আজ অচল হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য বিধাতাপুরুষকে দোষ দিলে তিনি তাহার জবাব দিবেন না সত্য ; কিন্তু এ অবস্থা হইতে মুক্তিও আমাদের মিলিবে না।

বর্ত্তমান অবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী এবং বিগত লড়াইয়ের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট দুইটি কারণ এখনও আমাদের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা হইতেছে—সমরঋণ ও বিজিত দেশসমূহের উপর ক্ষতিপূরণের দাবি। এই দুই দাবি একত্র করিলে এক শত কোটি টাকার উপর প্রতি বৎসরে অধমর্ণদের দেয়। এই টাকাটার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আমেরিকার এবং অবশিষ্ট ফ্রান্সের প্রাপ্য। বিশ্বের হাট হইতে প্রতি বৎসর এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা অপসৃত হইয়া দুইটি দেশের অর্থভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে থাকিলে এবং তদ্দরুণ অধমর্ণ দেশসমূহ এতগুলি অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার পরিণাম ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। এতগুলি টাকা ঋণপরিশোধের জন্য ব্যয় হওয়ার অর্থ, ঐ পরিমাণ মূল্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের হানি হওয়া। যাঁহাদের ভাণ্ডারে টাকা যাইতেছে তাঁহারা যদি উহা সঞ্চয় না করিয়া উদার ভাবে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলেও এতটা ক্ষতি হইত না। কিন্তু তাঁহারা ঐ অর্থ ব্যয় না করিয়া উহা দ্বারা নিজ নিজ স্বর্ণ-তহবিল স্ফীত করিয়া চলিয়াছেন। নগদ মুদ্রা না লইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা যদি অধমর্ণদিগের

নিকট হইতে ঐ মূল্যের প্রয়োজনীয় পণ্যও গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও হতভাগ্য অধমর্ণদের বাঁচিবার উপায় হইত। কিন্তু তাহা ত হইবার উপায় নাই ; অধিকন্তু অধমর্ণের দেশ ও অন্যান্য দেশ হইতে পণ্যের আমদানি বন্ধ করিবার সব ব্যবস্থাই বিধিমত ঠিক আছে। নিরুপায় হইয়া দেনদার দেশসমূহ দেশের টাকা যথাসম্ভব বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে বিদেশী মালের আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ঋণ পরিশোধের জন্য যে-কোন মূল্যে বিদেশে মাল বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, পুনরায় স্বর্ণমান পরিহার করিয়া নিজ নিজ দেশের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করতঃ বিদেশে নিজ মাল সস্তায় চালাইবার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে।* ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অধিকতর বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, জিনিষের চাহিদা ও মূল্য আরও হ্রাস পাইয়াছে। মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দেনদারের দেনার পরিমাণও আপনা হইতে বাড়িয়া চলিয়াছে। এতগুলি দেশকে পঙ্গু করিয়া শুধু একা সুখী ও লাভবান হওয়া বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের যুগে সম্ভবপর নহে। তাই আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও বড় সুখে নাই।

বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ সম্বন্ধে আমরা উপরে যে দীর্ঘ ও জটিল আলোচনা করিয়াছি, তাহার শাখা প্রশাখা ছাটিয়া ফেলিয়া আমরা যদি শুধু লড়াইয়ের সময়কার ও তাহার পরবর্ত্তী কালের দুইটি সরল ও সহজ চিত্র আমাদের মানস চোখের সম্মুখে কল্পনা করি তাহা হইলেই এই দুর্গতির অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনেও কোনরূপ সন্দেহ থাকিবে না।

লড়াইয়ের সময়কার চিত্রে আমরা দেখিতে পাই :—

---

* "স্বর্ণমান" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রথমতঃ, দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমরক্ষেত্রে আবাহন এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, গোলাবারুদ প্রস্তুতের জন্য অসংখ্য লোকের কর্ম্ম-নিয়োগ। সৈন্য-সামন্ত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কুলিমজুর, এক কথায় বলিতে গেলে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় কেহই এই নরমেধ যজ্ঞের আমন্ত্রণ হইতে বাদ যান নাই।

দ্বিতীয়তঃ, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ হইতে সুরু করিয়া সর্ব্বপ্রকার জিনিষের কল্পনাতীত চাহিদা বৃদ্ধি। প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট শুধু তৎকালীন প্রয়োজনের জন্য নহে, ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অসম্ভব রকম পণ্য প্রস্তুত ও সঞ্চয় করিতেছিলেন।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যহ যে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হইতেছিল তাহা সঙ্কুলন করিবার জন্য প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া কাগজীমুদ্রা ও ক্রেডিট সাহায্যে অর্থের পরিমাণ অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিলেন।

সুতরাং যুদ্ধের সময়ে কাহারও কর্ম্মাভাব হয় নাই; অর্থাভাব ঘটে নাই; কোন জিনিষ পড়িয়া থাকিতে পায় নাই।

কিন্তু পরবর্ত্তী চিত্রে আমরা কি দেখিতে পাই? প্রথমতঃ, লক্ষ লক্ষ লোক সমরাঙ্গন হইতে ফিরিয়া আসিল—কেহ সুস্থ শরীরে, কেহ বিকলাঙ্গ হইয়া। কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশের কর্ম্মক্ষেত্র অপরে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন শেস হওয়ায় পণ্যের অভাবনীয় চাহিদা অকস্মাৎ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পণ্যোৎপাদনের বিরাট ব্যবস্থা মুখব্যাদন করিয়া তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের পর দেশসমূহ আস্তে আস্তে স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাগজীমুদ্রা ও ক্রেডিট সঙ্কোচনপূর্ব্বক অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া মানুষের অর্থ

কাড়িয়া লইয়াছে। সুতরাং দেশে দেশে অসংখ্য লোকের কর্ম্মাভাব ও বেকার সমস্যা; চারিদিকে অর্থাভাব এবং বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-মন্দা।

তারপর বিজিত দেশসমূহের উপর কোটি কোটি টাকার ঋণভার ও ক্ষতিপূরণের দাবী, যাহার কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে—বোঝার উপরে শাকের আঁটির ন্যায়, চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করিয়াছে।

ধনবিজ্ঞানের পণ্ডিত না হইয়াও লড়াইয়ের অর্থনীতিটুকু আমরা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি বলিয়া বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দুঃসহ জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া ঘরে বসিয়া কবে আরেকটা লড়াই বাধিবে পথ চাহিয়া আছি। কিন্তু ইহাতেও একটু খটকা বাধিতেছে এই যে, লড়াই বাধিলে সোনার দরে লোহা এবং তৈলের বদলে জল বেচিয়া ধনী হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও উহার ফল ভোগ করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত পৈতৃক প্রাণটা বাঁচিবে কিনা। কারণ, এবার জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সাকারে, নিরাকারে, যে ভাবে মারণ-যজ্ঞ চলিবে তাহাতে ইঁদুরের গর্ত্তও নিরাপদ থাকিবে না।

এই যে নিজ হাতে তৈরি গোলকধাঁধার মধ্যে সভ্যতাভিমানী মানবজাতি চোখে ঠুলিবাঁধা জন্তুবিশেষের মত ঘুরিয়া মরিতেছে, এই অবস্থার প্রতিকার কি? বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ইহার একটা মীমাংসা হয়ত তেমন কঠিন নহে; কিন্তু মীমাংসাকে কার্য্যে পরিণত করাই দুরূহ। পরস্পর-সংশ্লিষ্ট এই আন্তর্জ্জাতিক ব্যাধির প্রতিকার করিতে হইলে প্রথমেই উগ্র জাতীয়তাবাদের মূলোচ্ছেদ করা আবশ্যক। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মনুষ্যত্ব, মানবপ্রীতি ধর্ম্মভাব সে হারে বৃদ্ধি পায় নাই। মনীষা দ্বারা যে অদ্ভুত সৃষ্টি সে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিয়াছে, হৃদয়ের উদারতার অভাবে আজ সে তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছে না। সমগ্র মানব জাতিকে সে নিজেই আহ্বান

করিয়া একত্র মিলিত করিয়াছিল ; আজ এই মিলনকে আবার সে নিজেই ক্ষুদ্র লোভ ও স্বার্থ-বুদ্ধির অধীন হইয়া পণ্ড করিতে বসিয়াছে। মানুষের উন্নতিকে অব্যাহত রাখিয়া ভাল ভাবে বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে একসাথে বাঁচিতে হইবে—অন্যজাতির শ্বাস রোধ করিয়া যদি বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে বিধির অমোঘ বিধান অদ্ভুত উপায়ে তাহার শোধ লইবে এবং আখেরে কাহারও মঙ্গল হইবে না। ভারত-রূপ কামধেনুর বাঁট আজ একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়ায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সকল দেশেরই ক্ষতি ও চিন্তার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্য-বিক্রয়ের সুবিধার জন্যই রাজ্য ও রাজস্বের আয়োজন, সেই জন্যই এত রেষারেষি, এত যুদ্ধবিগ্রহ। কিন্তু সেই পণ্য অর্থ-সামর্থ্য না থাকিলে কে কিনিবে? গোটা দুনিয়ার মাল চালাইবার এত বড় হাট এই ভারতবর্ষ। এই হাটে যদি তাহাদের মাল বিক্রয় বন্ধ হয় তবে এ-সব দোকানদারের জাত কি করিয়া বাঁচিবে? যে ব্যবসা-বাণিজ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর "অবারিত দ্বার" (free trade) নীতির অনুকূল হাওয়ায় অব্যাহত গতিতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবেশলাভ করিয়াছিল আজ তাহাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে নানা কল-কৌশলে বিদূরিত করিতে চাহিলে তাহা রক্ষা পাইবে কিরূপে? আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে বাঁচিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক মনোবৃত্তির আবশ্যক—ইউরোপের স্বার্থ-কলুষিত তীব্র জাতীয়তার হাওয়া তাহার পক্ষে মারাত্মক।

অবশ্য আর একটি পন্থা আছে—বিদেশীর সহিত সমগ্র ব্যবসা-সম্পর্ক তুলিয়া দিয়া আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া বাঁচা। প্রত্যেক দেশের অভাব ও প্রয়োজন নিজ দেশ হইতে মিটাইবার আয়োজন ও ব্যবস্থা করা এবং দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে শুধু নিজ দেশের প্রয়োজনে নিয়োজিত করা। আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষ, রুশিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে

ধনী প্রকাণ্ড দেশ সমূহের পক্ষে এ-পথে চলা তেমন অসাধ্য নহে। কিন্তু ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে এ-পথ বিনাশের পথ। প্রথম কথা বৎসরে ছ-মাসের খোরাকও ইংলণ্ডের নিজ দেশে উৎপন্ন হয় না। বিদেশের সহিত তাহার বাণিজ্য বন্ধ হইলে ইংলণ্ড অনাহারেই মারা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের যে-সব পণ্য পৃথিবীর হাট-বন্দর ছাইয়া ফেলিয়াছে, সে-সব তৈরির কাঁচামাল আসে সব বিদেশ হইতে। তাহারই বা কি উপায় হইবে? অন্য দিকে, উল্লিখিত বৃহৎ দেশগুলি ঐশ্বর্য্যের খনি হইলেও শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহারা অনেকে নূতন ব্রতী ও অনভিজ্ঞ। বিদেশ হইতে আধুনিক কলকব্জা ও অন্যান্য নানাবিধ সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করিতে না পারিলে তাহাদের চলিবে না। সকলের চাইতে বড় কথা এই যে, বিশ্বের সম্পদ ও জ্ঞানভাণ্ডার আজ জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট সকলের প্রয়োজনে উন্মুক্ত হইয়াছে। আমরা কি চীনাপ্রাচীর খাড়া করিয়া দিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া গিয়া আবার কূপমণ্ডুক হইয়া বসিব? ইহাতে কি জগতের প্রগতিকে শত সহস্র বৎসর পিছাইয়া দেওয়া হইবে না? আমরা নিজ দেশের মধ্যে আত্মসর্ব্বস্ব ও পূর্ণমনস্কাম হইয়া থাকিতে পারিব না; অথচ আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ও বাণিজ্যকেও স্বাভাবিক পথে চলিতে পদে পদে বাধা দিব—আমাদের বর্ত্তমান বিপত্তির গোড়ার গলদই এই পরস্পর-বিরোধী নীতির অনুসরণে। সুতরাং মানবজাতির স্বাভাবিক বিবর্ত্তন ধারাকে যদি আমরা ঠিক রাখিতে চাই, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ভাবের ও বস্তুর আদান-প্রদান যদি আমরা অব্যাহত রাখিতে চাই, তাহা হইলে পরস্পরকে অন্যায় রকমে আঘাত করিবার যত উপায় তাহা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শুল্ক-প্রাচীর (Tariff Wall) ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। তেলো মাথায় তেল

দেওয়া (subsidy) বন্ধ করিতে হইবে। শিল্প-অনুষ্ঠানে নূতন ব্রতী কোন কোন দেশের পক্ষে ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রবলের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ প্রাচীরের ও সাবসিডির সাময়িক প্রয়োজন থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহার প্রয়োগ আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল ও অনুন্নত জাতির জন্য যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং তদনুকূলে জাতি-সঙ্ঘের (League of Nationsএর) অনুমোদন থাকা সঙ্গত। অবশ্য সেই সঙ্ঘকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

সমস্ত গোলমালের মূলোচ্ছেদ করিবার আর একটি দুঃসাহসিক পন্থা আছে। কিন্তু তাহা যেমনই নূতন তেমনি ধনতান্ত্রিকদের পক্ষে মারাত্মক। পণ্য-বিনিময়ের সময় যে অর্থরূপ দালালটি মধ্যস্থ হইয়া কাজ করেন তিনি সমস্ত অনর্থের মূল ; কারণ তিনি বহুরূপী, তাঁহার রূপের বা মূল্যের কিছুই ঠিক নাই। এই দালালটিকে একেবারে বাদ দিয়া পণ্যের সহিত পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় করিতে পারিলে সব গোলমাল চুকিয়া যায়। মানুষের ভোগের জন্যই শিল্প ও পণ্যসম্ভারের প্রয়োজন—অর্থ পণ্যসম্ভারকে মানুষের নিকট প্রয়োজন ও সুবিধামত পৌঁছাইয়া দিবার একটি সহজ উপায় মাত্র। ইহা ভিন্ন অর্থের অন্য কোন সার্থকতা নাই। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই খামখেয়ালি দালাল-টিকে মাঝে রাখিবার দরকার কি ? এই প্রস্তাবে শ্রমিক বা সাধারণ সম্প্রদায়ের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে ধনিক সম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতির কারণ রহিয়াছে। সেইজন্যই এরূপ প্রস্তাবে তাঁহারা একেবারে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন এবং এই পথের পথিক রুশিয়াকে সকলে মিলিয়া কোণঠাসা করিবার চেষ্টায় আছেন। ধনী অর্থ চায় শুধু ভোগের সামগ্রী সংগ্রহের জন্য নহে, ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাবের অঙ্কটাকে যথাসম্ভব বড় করিয়া দেখিবার জন্য। ইহা প্রয়োজনের দাবী

নহে,—ইহা নিছক লোভ ও যুগযুগান্তের সংস্কার। সাধ মিটাইয়া ভোগ করিবার বিলাস-সামগ্রী ইহাদিগকে দিলেও ইহারা অর্থের মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। অথচ ইহাদের এই লোভের ফলে দুনিয়ার ধন আসিয়া কতিপয় ব্যক্তির হাতে জড় হইতেছে, কিন্তু ব্যবহারে লাগিতেছে না। কারণ মানুষের ভোগবিলাসিতার সীমা আছে। অন্যদিকে নানাবিধ পণ্যসম্ভার পড়িয়া আছে, অর্থাভাবে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ তাহার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতে পারিতেছে না। বিনিময়ের জন্য তৈরি না হইয়া পণ্যদ্রব্য যদি মানুষের ব্যবহার ও ভোগের জন্য তৈরি হইত এবং দেশের শাসনতন্ত্র যদি তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যকুশলতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিতরণ করিবার ভার গ্রহণ করিতেন (যেমন আজ রুশিয়ায় চলিয়াছে), তাহা হইলে ধনী-সম্প্রদায়ের ঘরে বসিয়া টাকায় তা দেওয়া বন্ধ হইত বটে, কিন্তু দুনিয়ার বঞ্চিতেরা কিঞ্চিৎ খাইয়া-পরিয়া বাঁচিতে পারিত। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত ধনে কাহারও অধিকার থাকিবে না। দেশের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য গণতন্ত্রের প্রতিনিধিগণের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে—তাহার ফলভাগী হইবে দেশের সকলে সমভাবে যোগ্যতানুসারে। অর্থ থাকিবে না বটে, কিন্তু অভাবও থাকিবে না; কারণ সকলের সকল রকম অভাব মিটান হইবে সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে। ব্যক্তিগত ধনাধিকার কিংবা কর্ম্মক্ষেত্রের স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার এ-ব্যবস্থায় স্থান পাইতে পারে না; কিন্তু আমাদের নিজেদের গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদিগকে খাটাইয়া লইয়া পরম যত্ন ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে আমাদের দৈহিক মানসিক সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মানবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ মঙ্গল হইবে না কি? যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইবার

ভয় আমরা করিতেছি, বর্ত্তমান অবস্থায় মানবজাতির সে অধিকার কি পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতেছে না?

এই নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া রুশিয়া আজ আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছে। সেখানে বেকার-সমস্যা নাই, জিনিষ সেখানে পড়িয়া থাকিতে পায় না। দেশবাসী সকলের সকল অভাব মিটাইয়া যে জিনিষ উদ্বৃত্ত হয় যে-কোন মূল্যে বিক্রয়ের জন্য তাহারা তাহা বিদেশে চালান করিয়া দেয়। ব্যক্তিগত লাভের জন্য জিনিষ তাহারা তৈরি করে নাই, লাভক্ষতি বিচার করিয়া বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করিবার তাহাদের তেমন প্রয়োজন হয় না। জিনিষের বিনিময়ে তাহারা বিদেশ হইতে যাহা পায় তাহাই তাহাদের লাভ। ১৯২৯ সালের পর ইউরোপ, আমেরিকা সর্ব্বত্র বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও জিনিষের উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। একমাত্র রুশিয়ার উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-মন্দার পরেও বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া একদল লোক সমাজ হইতে অর্থের একাধিপত্যকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিতেছেন এবং রুশিয়া-প্রবর্ত্তিত সমাজ ও অর্থনীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের মধ্যে ইহারা ব্যক্তিগত ধনবাদের চিরসমাধির স্বপ্ন দেখিতেছেন।

ধন ও ধনী-সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়া যদি এ অবস্থার প্রতিকার করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমেই ধন বা অর্থের খামখেয়াল ও স্বেচ্ছাচারকে বন্ধ করিতে হইবে। অন্যথা বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার আর অন্য পন্থা নাই। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা, বিভিন্ন মুদ্রার বিভিন্ন মূল্য, পরস্পরের মূল্য মধ্যে আবার অনিশ্চয়তা, পৃথিবীর মুদ্রাসমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি কি করিয়া মানুষের সকল হিসাবকে পণ্ড করিয়া দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যকে খর্ব্ব করে তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই

কিঞ্চিৎ দিয়াছি।* অর্থের এই সর্ব্বনেশে খেলা বন্ধ করিতে হইলে প্রথমেই আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার একান্ত আবশ্যক। সেইজন্যই লড়াইয়ের পর জেনেভা কন্‌ফারেন্সে স্বর্ণমান পুনর্গ্রহণের প্রস্তাব তাড়াতাড়ি গৃহীত হয়। ইহার ফলে স্বর্ণমান পরিহারের দরুণ বিভিন্ন দেশের মুদ্রামধ্যে বাট্টা বা বিনিময়ের হার লইয়া যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সকল মুদ্রার সমষ্টিগত মূল্যের স্থিরতা লাভ করা গেল না। কারণ বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে পরস্পরের আপেক্ষিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলেও পৃথিবীর মুদ্রা বা অর্থের মোট পরিমাণ স্থির রাখিতে না পারায় মুদ্রামূল্যও স্থির রহিল না। সমগ্র পৃথিবীর মোট মুদ্রার পরিমাণ একটি সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইলে সকল দেশের গবর্ণমেণ্ট ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের একমত হইয়া একযোগে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের মনোবৃত্তি বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ঘোরতর পরস্পরবিরোধী ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সেই সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

বিভিন্ন দেশ ও তাহাদের ব্যাঙ্কসমূহ একমত হইলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আরও একটি কারণে একপ্রকার অসম্ভব। আধুনিক জগতে বাজার-মর্য্যাদা বা credit কিরূপে অর্থের স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্যেক দেশের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে যদিবা সমর্থ হন, কিন্তু এই নিরাকার credit পদার্থটিকে আয়ত্তাধীনে আনিবেন কি প্রকারে? কোন্ দেশে কোন্ ব্যক্তির কি পরিমাণ ধার পাওয়া উচিত, তাহাকে কি পরিমাণে ধারে ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার মর্য্যাদা দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা

---

* "ভারতে মুদ্রানীতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দুঃসাধ্য বলিলেই হয়। অর্থের পরিমাণকে স্থির রাখিয়া তাহার মূল্য স্থির রাখিবার পথে ইহা একটি গুরুতর অন্তরায়। কিন্তু পন্থা দুরূহ হইলেও সকল দেশের সমবেত চেষ্টায় এই প্রতিবন্ধকতা দূর করিতে না পারিলেও চলিতেছে না। সেইজন্যই সমগ্র পৃথিবীর অর্থ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে তুলিয়া লইয়া একটি কেন্দ্রীয় শক্তির উপর দিবার কথা উঠিয়াছে। পরস্পর বিবাদমান জাতি-সমূহের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কতদূর সম্ভব তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয়।

বর্ত্তমান অবস্থার আশুপ্রতিকার করিতে হইলে অধমর্ণ জাতিসমূহের স্কন্ধ হইতে সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণের গুরুভার অবিলম্বে তুলিয়া লইতে হইবে। সকলের সম্মিলিত পাপের বিরাট বোঝা শুধু পরাজিত জাতি-সমূহের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ায় ইহারা আজ মরিতে বসিয়াছে। পৃথিবীর এতখানি ক্রয়শক্তিকে এভাবে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিলে ব্যবসা-বাণিজ্য কোন প্রকারেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে না। কেবল সমরঋণ ও ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করিলেও চলিবে না—পৃথিবীর যেখানে যত জাতি নিষ্ফল ঋণের চাপে মুষড়িয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকেও রেহাই দিতে হইবে। নতুবা পৃথিবীর ক্রয়শক্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। ইউরোপের বহু মনীষীও এ-কথা আজ স্বীকার করিতেছেন। ভারতের বিরাট পূর্ব্ব ঋণের কথা ছাড়িয়া দিলেও বিগত লড়াইয়ের সময় বিনা স্বার্থে ও বিনা কারণে শুধু আমাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট অভিভাবকের উপকারের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকারার্থ আমাদিগকে নূতন করিয়া বিশাল ঋণভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই সব ঋণের চাপ না কমিলে আমাদের আর্থিক উন্নতির পথ সুদূরপরাহত। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হ্রাস

পাওয়ায় কৃষিপ্রধান দেশসমূহের ঋণ-মুক্তি অধিকতর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান অবসাদ দূর করিতে হইলে যাঁহারা টাকা লইয়া গ্যাট হইয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকেও হাতের টাকা ছাড়িতে হইবে। খয়রাৎ করিবার কথা কেহ অবশ্য তাঁহাদিগকে বলিতেছেন না। একটা অনন্য-সাধারণ কুণ্ঠা ও অবিশ্বাস হইতে তাঁহারা যে-সকল ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন, ইহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। তবেই নূতন ব্যবসার পত্তন হইবে, বাজারে অর্থ নূতন করিয়া চলিতে সুরু করিবে, মানুষের জড়তা ও অবসাদ কাটিয়া গিয়া ব্যবসা-জগতে নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। বনের বাঘ অপেক্ষা মনের বাঘ আমাদিগকে অধিক কাবু করিয়া ফেলিয়াছে; ফলে দুনিয়ার সকল অর্থ বাজার হইতে মানুষের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। এই অর্থ পুনরায় ঘরের বাহির না হইলে মৃতপ্রায় ব্যবসা-বাণিজ্য আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। এই সম্পর্কে আরও একটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান অনাস্থা ও অবিশ্বাসের ফলে ধারে কার্য্য করিবার সুযোগও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষকে এই সুযোগ ফিরাইয়া দিতে হইবে; তাহার কর্ম্মক্ষমতার উপর আবার বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। কারণ মানুষের এই মর্য্যাদা (credit) অর্থের প্রয়োজন যে কতখানি মিটাইতে পারে তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মানুষকে তাহার কর্ম্ম-কুশলতা অনুযায়ী খানিকটা বিশ্বাস না করিলে কেবল নগদ অর্থ দিয়া সকল সময় কাজ করা কঠিন। তাই অর্থের সঙ্কোচন দূর করিতে হইলে অকাতরে অর্থব্যয় করা যেমন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তেমনই মানুষকে তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা বা credit দান করারও প্রয়োজন

হইয়াছে। অর্থব্যয় সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও ধনীসম্প্রদায়ের দায়িত্বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; কারণ শক্তি ও সুযোগ তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বে শুধু লড়াই বাধিলে গবর্ণমেণ্ট অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। তদ্ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় তাহাদের ব্যয়ের ধ'রা একটা ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে দেশের নানাবিধ বিরাট জনহিতকর অনুষ্ঠানের (public utility concern এর) সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। রুশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্যান্য দেশেও আজকাল গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে, পাব্লিক ট্রান্সপোর্ট, সেচ, খাল-খনন, বৈদ্যুতিকশক্তি সরবরাহ, জাহাজনির্ম্মাণ, সাধারণের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানাবিভাগের কর্ত্তৃত্বভার নিজহাতে গ্রহণ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ প্রয়োজনীয় ও লাভবান কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনীসম্প্রদায়কেও এই সব অনুষ্ঠানে অর্থনিয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহারাও লাভবান হইবেন, দেশের বেকারের সংখ্যাও অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ক্রেডিট প্রতিষ্ঠা ও অর্থব্যয় করিয়া বাজারের ঘাটতি টাকা পূরণ না করিলে এই অসচ্ছল অবস্থা যে কিছুতেই দূর হইবে না, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, শিল্পজগতে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য অংশতঃ দায়ী। নিত্য নূতন সৃষ্টির ফলে অপ্রয়োজনে যে অর্থব্যয় হইতেছে, প্রকৃত প্রয়োজনে তাহা ব্যয় হইলে জনসাধারণকে এতটা ভুগিতে হইত না। ধনী ক্রেতার অপব্যয় বাঁচিয়া যাইত, এবং বিক্রেতাকেও নিত্য-নূতন জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া হয়রান ও নাকাল হইতে হইত না। তাই আজ এমন কথাও উঠিয়াছে যে,

কিছুকালের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রতিকারের পথ থাকিলেও তাহা অনুসরণের উপায় নাই। বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে বাঁচিতে হইলে যে দুর্জ্জয় সাহস, উদার বিশ্বাস ও একান্ত সহযোগিতার আবশ্যক তাহা আজ কোথায়? পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন জাতির মনোভাব দেখিলে আমাদের একটি পুরাতন গল্পের কথা মনে পড়িয়া যায়। দুইটি ভদ্রলোক এক ট্রেনে যাইতেছিলেন। উঁহাদের মধ্যে একপাটি চটি বদল হইয়া যায়। এই ভুল ধরা পড়ে একজনার ষ্টেশনে নামিবার পর। ততক্ষণে ট্রেন চলিতে সুরু করিয়াছে। প্লাটফর্ম্মের যাত্রীটি গাড়ীর যাত্রীকে তাঁহার পাদুকাটি প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিবার জন্য চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে থাকেন, এবং গাড়ীর যাত্রীটিও তাঁহার পাদুকাখানি গাড়ীর ভিতর ছুঁড়িয়া দিবার জন্য বলিতে থাকেন। কেহই কিন্তু ভরসা করিয়া অপরের জুতাটি আগে হাতছাড়া করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে গাড়ীটি প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। প্লাটফর্ম্মের যাত্রীটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িলেন; গাড়ীর যাত্রীটি জানালা দিয়া ব্যাকুল নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরিণামে একপাটি চটি লইয়া উভয়কে ঘরে ফিরিতে হইল।

দেশীয় শিল্পের অন্তরায়।

বর্ষার সন্ধ্যায় কলিকাতার এক সুপরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধুর বৈঠকখানায় বসিয়া তাম্রকূট ও চায়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিলাম। বন্ধুটি বহু অর্থ খোয়াইয়া, অনেক দিনের আপ্রাণ চেষ্টা ও কঠিন পরিশ্রমের পর, ব্যবসায়টিকে দাঁড করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রস্তুত কেমিক্যাল্‌স্‌, ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্য বাজারে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অর্থের অভাব ইঁহাদের এখন আর নাই। অধিকন্তু এই কারখানা হইতে এক্ষণে কতগুলি দেশী লোকের প্রতিপালনের উপায় হইয়াছে।

ইঁহারই অপর একটি বন্ধুও শনিবারের অবসর যাপনের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেশী বিস্কুটের কারখানার মালিক—সঙ্গে অন্য কারবারও আছে। অবস্থা বেশ সচ্ছল। তার পর আর একটি বন্ধু আসিয়া জুটিলেন; তিনি দেশী ওয়াটার প্রুফের কাজ করেন। তাঁহার কারবারও প্রথম দিককার বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে ভালই চলিতেছে। ইঁহাদের সহিত দেশীয় শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একটি বন্ধু আমাকে খানিকটা অনুযোগের সুরে বলিলেন,—"মশায়ত অর্থনীতি সম্বন্ধে খুব প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শুধু বড় বড় থিওরি লইয়া আলোচনা করিয়া কি লাভ? দেশীয় শিল্পের প্রসার কেন আশানুরূপ হইতেছে না, দেশীয় ব্যবসায়ীদের দুঃখ দুর্গতি কিসে দূর হইতে পারে, এত বক্তৃতা ও প্রচার সত্ত্বেও কোথায় সত্যিকারের গলদ রহিয়াছে—এ

সব ক্ষুদ্র বিষয়ে একটু নজর দিন, আলোচনা করুন। তাহা হইলে আমরা যে বাঁচিয়া যাইতে পারি।"

"হাতে নাতে যাঁহারা কাজ করিতেছেন এবং যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা পরিষ্কার ভাবে না জানাইলে, বাহির হইতে পণ্ডিতি আলোচনা করা ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি?"—বিনীতভাবে এই কথা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তরায় সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে কতকগুলি কথা আমাকে বলেন। তাহাই সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করিব।

দেশীয় শিল্পের প্রথম ও চিরন্তন সমস্যা যথেষ্ট মূলধনের অভাব। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ব্রতের প্রথম সূত্রপাত এই বাংলায় সুরু হয়। পরে বাংলা হইতে ইহা ক্রমে গোটা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই বাংলার Industrial Renaissance বা শিল্পযুগের আরম্ভ। সেই সময়ে দেশপ্রীতির নূতন প্রেরণায়, ছোট-বড় নানাপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম চিরদিনের দ্বিধা ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে তাহার মূলধন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক দিকে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান-কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি প্রভৃতি বৃহৎ অনুষ্ঠান যেমন তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্য দিকে তেমনি ছোট কলকারখানার তৈরি গেঞ্জি, মোজা, কালি, কলম, নিব্, পেন্সিল, জুতা, সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, বাক্স, সাবান, দাঁতের মাজন, ছুরি, কাঁচি, খেলনা, পুতুল, জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, প্রসাধন-দ্রব্য ইত্যাদি নানাবিধ স্বদেশী জিনিষ আমরা বাজারে প্রথম দেখিতে পাই। উৎসাহের তুলনায় বড় কারখানার উপযোগী মূলধন

যে তখন খুব বেশী পাওয়া গিয়াছিল তাহা নহে; উল্লিখিত অধিকাংশ শিল্পদ্রব্যই স্বল্পপুঁজিবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা প্রসূত। উৎসাহ তখন যেমন প্রবল ছিল, মূলধন তদনুপাতে তেমন প্রচুর ছিল না। স্বদেশী যুগ হইতে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদিগকে মূলধনের জন্য যে অসুবিধা ভোগ এবং সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইতেছে, তাহার নিবৃত্তি আজও হয় নাই। দেশীয় যৌথ-কারবারের নিষ্ফল ব্যর্থতাই ইহার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব, রাতারাতি বড় লোক হইবার আকাঙ্ক্ষা, অতিরিক্ত স্বার্থপরতা ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালীর স্বদেশী যুগের অন্যতম কীর্ত্তি বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্কের ভরাডুবি হইয়া গেল; বাঙ্গালীর বুকের রক্ত দিয়া তৈরি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ ডুবিতে ডুবিতে জনৈক ধনী বাঙ্গালীর অনুগ্রহে কোন প্রকারে রক্ষা পাইল। এই সব অপ্রিয় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও লড়াইয়ের সময় Currency Inflation বা মুদ্রাসম্প্রসারণ নীতির ফলে কিছু কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া এ দেশে যখন একসাথে কতকগুলি যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠার ধূম পড়িল, তখন তাহার মূলধন সংগৃহীত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই সুযোগের কিছুমাত্র সদ্ব্যবহার আমরা করিতে পারি নাই। বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-সঙ্কোচ সুরু হইবার পূর্ব্বেই কতকগুলি অপরিণামদর্শী ব্যক্তির কৃত কর্ম্মের ফলে এই সব কোম্পানীর অধিকাংশ জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে—পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে—বহু হৃতসর্ব্বস্বের দীর্ঘশ্বাস এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি একটা দারুণ অবিশ্বাস। তাহার উপর আসিয়া চাপিয়াছে বর্ত্তমান এই জগৎ-জোড়া দুর্গতি। আজ যে একদল বাঙ্গালী সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান দুঃসময়ের পীড়ন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কৃত কর্ম্মের ফল ভাল করিয়াই ভোগ করিতে

হইতেছে। বলিতে গেলে একটিও দেশীয় ব্যাঙ্ক নাই যেখানে তাঁহারা প্রয়োজনে সামান্য অর্থের জন্যও হাত পাতিতে পারেন। দেশীয় ধনী সম্প্রদায়ের দ্বারও তাঁহাদের জন্য রুদ্ধ-প্রায় বলিলেই চলে। কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা ভগবান তাঁহার সহায়; তাই মূলধনের অভাবকেও অতিক্রম করিয়া ইঁহারা নিজ নিজ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আজও বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহাদের সমস্যা আজ অন্য রকমের এবং তাহাই এই প্রবন্ধের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

সমস্যাটিকে এক-কথায় আমরা marketing problem কিম্বা জিনিষের বণ্টন বা বিক্রয় সমস্যা বলিতে পারি। মূলধনের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও স্বদেশী জিনিষ আজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং অনেক জিনিষও ভালই হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, জিনিষ ক্রেতাদের নিকট পৌছান যাইবে কি করিয়া। দেশী জিনিষের প্রতি শিক্ষিত ক্রেতাদের যতই দরদ থাকুক না কেন, দেশীয় দোকানদারগণের কিন্তু ইহার প্রতি একটি চিরন্তন বিরাগ বা বিরূপ ভাব চলিয়া আসিয়াছে। ইহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, দেশীয় শিল্পের প্রতি ইহারা কখনও তেমন প্রাণের টান অনুভব করেন নাই। অবশ্য এইজন্য দেশীয় শিল্পীদের কোন ত্রুটি নাই এ কথা আমরা বলিতেছি না। স্বল্প পুঁজি লইয়া কাজ করিতে যাইয়া অনেক সময়েই দেশী কারিগর বা শিল্পী রীতিমত জিনিষ সরবরাহ করিতে পারেন না। অনভিজ্ঞতা ও অন্যান্য কারণে জিনিষের ষ্ট্যাণ্ডার্ডও সকল সময় স্থির রাখিতে সক্ষম হন না। এইরূপ নানা ত্রুটি তাঁহদের ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পের প্রতি দোকানদারগণের একটু দরদ থাকিলে তাঁহারা ক্ষতি স্বীকার না করিয়াও দেশীয় শিল্পের অনেকখানি সহায়তা করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা

দেশীয় কারিগরের আর্থিক অসচ্ছলতা ও অতি-আগ্রহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টাই সাধারণতঃ করিয়া থাকেন। দেশী জিনিষ ইঁহারা নগদ্ মূল্যে প্রায় কখনও ক্রয় করেন না। যাঁহাদের জিনিষ দয়া করিয়া রাখেন, তাঁহাদিগকেও নিতান্তই কৃপা করিতেছেন এই ভাবটাই ইঁহারা সাধারণতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিক্রয় করিয়া মূল্য দিবেন দেশী জিনিষের বেলা এইরূপ সর্ত্ত করা হয়। যাঁহাদের জিনিষের বেশ চাহিদা আছে এবং যাঁহারা ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান, শুধু তাঁহাদের সহিত Sightএ অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে পর, টাকা দিবার সর্ত্ত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এই সর্ত্তও দেশীয় দোকানদারগণ অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করেন না। অসামর্থ্যই যে সকল সময় ইহার কারণ তাহাও নহে। দেশীয় শিল্পীদের প্রতি দোকানদারগণের যে অহেতুক অবজ্ঞার ভাব আছে, তাহাই সাধারণতঃ এইজন্য দায়ী। অনেক সময় এমনও হয়, দেশী জিনিষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা উহার কারিগরের বিল না মিটাইয়া তাঁহারা ঐ টাকা দিয়া রবিন্সন্ বার্লি, গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ, হরলিক্স্ কিম্বা ঐরূপ অন্য কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিদেশী জিনিষ নগদ মূল্যে আমদানি বা ক্রয় করিয়া থাকেন; নয় ত উহাদের হুণ্ডির টাকা মিটাইয়া দিয়া থাকেন। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের দোকানদারগণ দেশীয় শিল্পীকে উপবাসী রাখিয়া তাঁহাদেরই প্রাপ্য অর্থ দ্বারা বিদেশী জিনিষের মূল্য জোগাইতেছেন এবং তাহার ফলে দেশী কারিগরের মূলধনের অভাব তাহার জিনিষ বিক্রয় দ্বারাও অনেক সময়ে দূর হইতে পারিতেছে না! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এক্ষণে যে দুঃসময় চলিয়াছে, তাহাতে অনেক দোকানদারের অবস্থাও সচ্ছল নহে। এই অবস্থার ফলও পরিণামে দেশীয় শিল্পকেই ভোগ

করিতে হইতেছে। বিদেশী জিনিষের জন্য নগদ মূল্য দিতে হয়; অথচ আজকাল বেচা-কেনা কমিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ে তেমন লাভ নাই। তাই ইঁহারা অনেক সময়ে দোকানের মূলধন ভাঙ্গিয়া সংসার খরচ চালাইতে বা দোকানের ঘরভাড়া, ইলেক্‌ট্রিক বিল, এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের মাহিনা দিতে বাধ্য হন; এবং পরিশেষে দোকানদারের ক্ষতি আংশিকভাবে হইলেও, দেশীয় শিল্পীর উপর আসিয়া পড়ে; কারণ সকলের দাবী মিটাইবার পর তাহার ভাগেই পড়ে ফাঁকি।

আজকাল এক শ্রেণীর দোকানদার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা অনন্যোপায় হইয়া দোকান খুলিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যাই বেশী; সুশিক্ষিত ভদ্রলোকও আছেন। ইঁহাদের মূলধন নাই, ব্যবসাও জানেন না; কিন্তু দেশীয় শিল্পীদের নিকট ধারে জিনিষ পাওয়া যাইবে, ইহা ভালরূপেই অবগত আছেন। জিনিষ লইবার সময় ইঁহারা যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন এবং ধারে জিনিষ পাইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে মধ্যস্থ বন্ধুর সাফাই সাক্ষ্যেরও অভাব হয় না। তার উপর স্বদেশ সেবার সুযোগ লাভের জন্য ইঁহাদের এইরূপ প্রশংসনীয় উদ্যম উপেক্ষা করাও কঠিন! সর্ব্বোপরি, দেশীয় শিল্পীর গরজ বড় বালাই। এইরূপ অনুরোধ উপরোধ লাভ দেশী কারিগর ও শিল্পীর ভাগ্যে সচরাচর বড় ঘটে না। সুতরাং এই সব অনন্যোপায় অনভিজ্ঞ নূতন ভদ্রলোক দোকানদারগণ তাঁহাদের দোকানের জন্য স্বদেশী মাল পান, কিন্তু যে সব স্বদেশবাসী মাল দেন তাঁহাদের অনেকেই মূল্যের টাকাটা পান না। এভাবে বেকার সমস্যা সমাধানেও ইঁহাদের অনিচ্ছাকৃত অবদান নিতান্ত সামান্য নহে!

ভাল বা বড় দোকান সহজে দেশী জিনিষ রাখিতে চায় না। বিজ্ঞাপনের পিছনে অর্থব্যয়, শিক্ষিত ক্রেতার দেশপ্রীতি ও জিনিষের

নিজগুণে কোন জিনিষের চাহিদা যদি নিতান্তই বৃদ্ধি পায়, তখনই কেবল ইঁহারা ঐ সকল জিনিষ রাখিতে স্বীকৃত হন। একে জিনিষ প্রস্তুত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ কুলানই এইসব শিশু শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে দুঃসাধ্য; তাহার উপর বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহন করা ইহাদের পক্ষে অনেক সময় বোঝার উপর শাকের আঁটি হইয়া পড়ে। অন্য দিকে বহুদিনের পরিচিত বিদেশী জিনিষের বাজারে বিজ্ঞাপনের তেমন আবশ্যক হয় না; আর বিনা প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন দিতেও তাঁহাদের অর্থাভাব নাই ; মাল চালাইবার জন্য দোকানদারগণকেও তাঁহাদের খোসামোদ করিতে হয় না। শুধু তাহাই নহে। সাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাসী ধনীর সৌখিন উপকরণাদি সর্ব্বপ্রকার পণ্যসম্ভার জাপান এরূপ অসম্ভব রকম সস্তায় সরবরাহ করিতে সুরু করিয়াছে যে, উহা দেশীয় শিল্পের পক্ষে ত মারাত্মক হইতেই পারে—অন্যান্য শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের পক্ষেও অত্যন্ত ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কলুটোলা, রাধাবাজার, ক্যানিং ষ্ট্রিটের বড় বড় দোকানদার-গণ সর্ব্বদা এই সব নিত্য নূতন জাপানী মাল সস্তায় আনাইয়া অধিক লাভে বিক্রয়ের আশায় মাথা ঘামাইতেছেন। অন্যান্য জিনিষের সহিত ইহাদের মূল্যের এত পার্থক্য যে, লাভের অঙ্ক বেশী রাখিয়া এই সব জিনিষ বিক্রয় করা অনেকটা সহজসাধ্য। কলিকাতার এইসব বড় বড় পাইকারী দোকান হইতেই মফঃস্বলে মাল চালান হয়; কারণ মফঃস্বলের দোকানদারগণ ইঁহাদের নিকট হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় বৎসরের মাল ক্রয় করিয়া নেন। অনেক দিনের ব্যবসা সম্পর্কের ফলে এবং অন্যান্য নানা কারণে ইহাদের মধ্যে একটা বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ আসিয়া যায়। এবং মফঃস্বলের দোকানদারগণ কলিকাতার ব্যবসায়ীর নিকট হালফ্যাশনের বিষয় অবগত হইয়া অনেকটা তাঁহাদের উপদেশ

অনুযায়ী মাল পছন্দ করিয়া থাকেন। কলিকাতার ব্যবসায়ীকে নগদ মূল্য দিয়া কিম্বা সঙ্কীর্ণ সময়ের ম্যাদে মূল্য দিবার সর্ত্তে জাপান হইতে মাল আমদানী করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হয় যত সত্বর সম্ভব এই মাল বিক্রয় করিয়া ফেলা। সেইজন্য মফঃস্বলের দোকানদারগণের নিকট ইঁহারা এই সব মাল চালাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এইভাবে বিনা আড়ম্বরে, প্রায় বিনা বিজ্ঞাপনে, এই সব সস্তা জাপানী মাল সুদূর পল্লীগ্রামের নগণ্য বিপণিতে পর্য্যন্ত সহজেই স্থান লাভ করে।

এখানে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাপানের মুদ্রা-সম্পর্কীয় নীতি এবং এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা জাপানের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতার সমস্যাকে আরো গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। জাপানী ইয়েনের মূল্য ছিল শতকরা ১৫০৲ টাকা। সেই স্থলে স্বর্ণমান পরিত্যাগ ও মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে এক্ষণে মাত্র ৭৫৲।৭৬৲ টাকা! জাপানী মাল এতটা সস্তা হওয়ার ইহাও একটি প্রধান কারণ। জাপানী ব্যবসায়ী তাহার জিনিষের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় একশত ইয়েনই পাইতেছে কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের রৌপ্য-মুদ্রা ও জাপানের ইয়েনের মূল্যের মধ্যে এতটা তারতম্য হওয়ায় আমাদিগকে ১৫০৲ টাকার স্থলে এক্ষণে দিতে হইতেছে মাত্র ৭৫৲।৭৬৲ টাকা। ইয়েনের মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া জাপান এইভাবে আমাদের বাজার নিজ পণ্যে ছাইয়া ফেলিবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছে। সেইজন্যই ভারতবাসী রৌপ্যমুদ্রার মূল্য এক শিলিং ছ' পেনি হইতে, বেশী কম না হইলেও, অন্ততঃ এক শিলিং চার পেনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য

এত দরবার, এত আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই দাবিটুকু তাহার আজ পর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নাই।

ভারতীয় শিল্পীদের আর একটি বিপত্তি এই যে, একই জিনিষ বিভিন্ন দোকানদার বিভিন্ন দরে বিক্রয় করে। ইহাতে ক্রেতাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়, এবং বিরক্তিরও কারণ ঘটে। ক্রমে দেশী ব্যবসায়ী ও তাহার জিনিষ উভয়ের উপরই একটা অনাস্থা আসিয়া পড়ে। কোন বিদেশী নামকরা জিনিষের বেলা কিন্তু সমস্ত বাজার ঘুরিয়া আসিলেও দামের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে না। নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা ঐ সব জিনিষ কেহ কম দরে বিক্রয় করিলে তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে মাল পাওয়া কঠিন হইবে। কিন্তু দেশী জিনিষের বেলা অনেক দোকানদার তাহার প্রতিবেশীর খরিদদার ভাঙ্গাইবার জন্য কিম্বা বিদেশী জিনিষের হুণ্ডির টাকা পরিশোধ করিবার তাড়নায়, নিজ ইচ্ছামত লাভের অংশ কম ধরিয়া অথবা নিজের লাভ একেবারে বাদ দিয়া জিনিষ বিক্রয় করে। অনেক দেশী নামজাদা চল্‌তি জিনিষের দরও সেইজন্যই অনেক সময় এক এক দোকানে এক এক রকম দেখিতে পাওয়া যায়।

মূলধনের অভাব, মুদ্রানীতি সম্পর্কীয় অব্যবস্থা, দেশীয় ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাঙ্কের অসদ্ভাব, অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি গুরুতর প্রতিবন্ধকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেশীয় শিল্পীগণ তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের কাটতি বা বণ্টন সম্পর্কে দেশী ব্যবসায়ীর নিকট অধিকতর সহানুভূতি এবং ব্যবসানুমোদিত সঙ্গত ব্যবহার পাইলে তাহাদের অনেকখানি অশান্তি ও অন্তরায় দূর হইতে পারিত। এই অন্তরায়ের মূলে ব্যবসায়ীগণের ন্যায্য স্বার্থ কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে বুঝিতে পারিলেও কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যাইত। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকখানি বিপরীত সংস্কার,

সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, অন্যায় লাভের আশা আছে বলিয়াই আমাদের পরিতাপের কারণ হইয়াছে। এই অবস্থার আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। আজকাল কেনাবেচার ব্যবসায়ে বহু উচ্চশিক্ষিত দেশ-হিতৈষী লোক প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের বিশেষ নিবেদন তাঁহাদের কাছে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 'গিল্ড' বা সঙ্ঘ হইয়াছে। সেই সঙ্ঘের সমষ্টিগত স্বার্থ-রক্ষার্থ সকলকেই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। ইহাতে সাময়িকভাবে কাহারও ক্ষুদ্র স্বার্থে আঘাত লাগিলেও, সঙ্ঘের সাধারণ কল্যাণ সাধিত হইয়া পরিণামে সকলের স্থায়ী মঙ্গল সম্ভব হয়। দেশীয় দোকানদারগণের মধ্যে এরূপ কার্য্যকরী সঙ্ঘের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে নিজেদের মধ্যে একতাবর্দ্ধন দ্বারা অনাবশ্যক প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ হইবে, সংহতি ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এবং ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও দেশের উপকার করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

অন্যদিকে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীগণেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিশেষ বিশেষ শিল্পের এরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যে না আছে তাহা নহে। কিন্তু ইহাদের শুধু কাগজপত্রে টিকিয়া থাকিলে চলিবেনা—প্রকৃত সংহত-শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা এমন একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানের কথা জানি যাহার কোন কোন সভ্য নিজেদের জিনিষের সর্ব্বনিম্ন মূল্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা স্থির করিবার পরও দিল্লী সিমলা যাইয়া ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গোপনে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার ও অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণের মধ্যে এরূপ ব্যাপার অহরহ হইতেছে। সঙ্ঘের নির্দ্দেশ গোপনে অমান্য করিয়া rate-cutting বা মূল্য হ্রাসের পরিণাম কি তাহা জানিয়াও সাময়িক লাভের প্ররোচনায় এভাবে অদূরদর্শিতার পরিচয়

দিতে আমরা কুণ্ঠিত হইতেছি না। ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে? সে কথা থাক্; প্রয়োজন হইলে বড় বড় সহরে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর ও শিল্পীগণকে একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের নিজেদের পণ্যের জন্য একটী বৃহৎ স্থায়ী বিপণির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরশ্রীকাতরতা, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ জ্ঞান, ভেদবুদ্ধি, অসহিষ্ণুতা এরূপ মিলনের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় জীবনে চিরদিন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু উচ্চ আদর্শের প্রেরণা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি এই সব হীন প্রচেষ্টা হইতে আমাদিগকে মুক্তি না দিলে আমাদের আর কোন উপায়ও নাই।

যে দেশে টাকা নাই

সে একদিন ছিল যখন মানুষের অভাববোধ এমন করিয়া জাগ্রত হয় নাই, তাহার প্রয়োজনের তাগিদ এরূপ দুর্ব্বার হইয়া উঠে নাই। "মোটা কাপড়, মোটা ভাত" হইলেই তাহার দিন চলিত। ভগবৎদত্ত প্রচুর নৈসর্গিক ভাণ্ডার হইতে তখনও সে নানাবিধ রত্ন আহরণ করিতে শেখে নাই। পৌরাণিক যুগের কথা বলিতেছি না, মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কথাই বলিতেছি। আমরা আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে নব নব কীর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি, তখন তাহার সামান্য সূচনামাত্র আরম্ভ হইয়াছে। বিশাল পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য করতলগত করিবার কৌশল তখন পর্য্যন্ত মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জীবন তখন সহজ ও স্বাভাবিক ছিল; মানুষের সহিত মানুষের, জাতির সহিত জাতির স্বার্থ-সংঘর্ষ তখন সময় সময় কঠিন হইলেও এমন জটিল হয় নাই; জীবন সংগ্রাম এরূপ মারাত্মক হইয়া উঠে নাই। তাই সেদিন মানুষ নিজ নিজ শক্তি ও সুযোগ অনুযায়ী ইচ্ছামত আপন পথ বাছিয়া লইতে পারিয়াছিল; নিজ নিজ সাধনালব্ধ জ্ঞানফল আপন ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারিয়াছিল। তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলিবার পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই। সেই পূর্ণ সুযোগ ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া মানুষের মধ্যে যাহারা উদ্যোগী ও প্রতিভাশালী তাহারা নানাক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্ম্মকুশলতা দ্বারা শিল্পজগতে যুগান্তর আনয়ন করিতে পারিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হইয়া বসিয়াছিল। এই সব উদ্যোগী কর্ম্মকুশল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অধিপতি-

গণকে Business Entrepreneur বলা হইত। রাজশক্তির তখন একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল প্রজাসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় করা, দেশের ভিতর শান্তি রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে সুরক্ষিত রাখা। দেশের শিল্পবাণিজ্যের সহিত তাহার কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল, ইহাকেই ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে Laissez Faire বা Policy of Non-interference বলা হইত। কতকটা প্রয়োজন ও অবস্থার দায়ে এবং কতকটা জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্বের দরুণ ইংরেজ জাতি শিল্পবাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নৈসর্গিক সম্পদ মোটেই প্রচুর নহে; তাহার দেশে তিন চারি মাসের খোরাকের পরিমাণ শস্য পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় না। চারিদিকে তাহার সমুদ্র। সাগর পার হইয়া বিদেশ হইতে এই ঘাটতি খোরাক তাহাকে সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহার মূল্য দিবার জন্য শিল্পজাত দ্রব্য তাহাকে বিদেশে পাঠাইতে হয়। সেই প্রয়োজনের তাগিদ হইতেই শিল্প ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে তাহার অর্থ ও শক্তি নিয়োগের আবশ্যক হইয়াছিল সর্ব্বপ্রথম। শুধু তাহাই নহে, এক দিকে খাদ্যশস্য ও শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানি করা তাহার পক্ষে যেরূপ নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে ঐ সব কাঁচামাল হইতে যন্ত্রে তৈরি শিল্পসম্ভার বিদেশে রপ্তানি না করিয়া আমদানী জিনিষের মূল্য দিবার ও ধনাগমের অন্য কোন উপায় তাহার ছিল না। সেই জন্যই ইংলণ্ড ছিল অবাধ বাণিজ্যনীতির (Free Tradeএর) একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রয়োজনে শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ হওয়ায় ইংলণ্ডের অনেকখানি সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পশ্চিমের অন্যান্য দেশ—বিশেষরূপে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও আমেরিকা

—শিল্পজগতে নিজ নিজ শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এই যান্ত্রিক-যুগ ও শিল্পোন্নতির সূচনা। নূতন নূতন বিলাস সামগ্রীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভোগের স্পৃহা ও স্পর্দ্ধা স্বাভাবিক নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বিশ্বের সেই নবজাগ্রত বিরাট ক্ষুধা মিটাইবার ভার পাশ্চাত্য দেশের যে সব জাতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের আয়োজন, প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই প্রচুর ছিল না। তাই সেই সময়ে বিশ্বের হাটে পাশ্চাত্য ব্যবসাদারগণের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার তেমন অবকাশ হয় নাই। উহারা সকলেই নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের ভোগলিপ্সার খোরাক জোগাইয়া সমভাবে লাভবান হইতেছিল। কিন্তু বিজ্ঞান দেখিতে দেখিতে বায়ু ও বিদ্যুৎকে পদানত করিয়া অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়া বসিল এবং আলাদীনের দৈত্য অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর ও শক্তিশালী যন্ত্রদানবের সাহায্যে এক এক মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ ভোগসামগ্রী কোটী কোটী লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ধরিল। তখনই উপস্থিত হইল বিভ্রাট। অবাধ বাণিজ্যনীতির নৌকা ভরা জোয়ারে পাল তুলিয়া চলিতে চলিতে চোরা-বালিতে আসিয়া ধাক্কা খাইল। বড় বড় ব্যবসার মালিকগণ বৎসরের পর বৎসর লাভের অঙ্ক দ্বারা যতটা ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন ভোগলিপ্সা মিটাইবার জন্য ক্রেতাগণের সংখ্যা বা অর্থ সেই পরিমাণে বাড়িতে পারিল না। তাহাতেও কারখানার মালিকগণের চৈতন্যোদয় হইল না, ধনলিপ্সা হ্রাস প্রাপ্ত হইল না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিল। ফলে এই দাঁড়াইল যে, দুনিয়ার অধিকাংশ ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পদ কতিপয় দেশের কতকগুলি লোকের হাতে আসিয়া জড় হইল। এক দিকে পণ্যসম্ভারের প্রাচুর্য্য, অন্য দিকে জনসাধারণের অর্থাভাব। তখনই সুরু হইল মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে রেষারেষি ও

কঠিন প্রতিযোগিতা। কে কাহাকে পরাজিত করিয়া নিজ পণ্য অপরের নিকট বিক্রয় করিবে, ইহা একটা মস্ত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেক মালিক বা ধনী কিন্তু নিজ বুদ্ধি ও খেয়ালমত পূর্ব্ব-অভ্যাস অনুযায়ী স্বাধীন-ভাবেই চলিতে লাগিল। এই অবস্থা-সঙ্কট দূর করিবার জন্য পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ বা সহযোগিতা সম্ভব হইল না। প্রতিযোগিতা যতই কঠিন হইল, একজাতির অপর জাতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া নিজের পথ সুগম করিবার হীন চেষ্টা ততই প্রবল হইয়া উঠিল। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টা দ্বারা এক দেশের ব্যবসায়ী যখন অপর দেশের ব্যবসায়ীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না, তখন সেই দেশের রাজশক্তির পক্ষে আর চুপ করিয়া থাকা পোষাইল না। প্রত্যেক জাতির ও দেশের কল্যাণের জন্য তাহাদের শাসন-তন্ত্রের যে দায়িত্ব আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইল। ফলে অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) ও নির্ব্বিরোধ (Laissez Faire) নীতিকে খর্ব্ব করিয়া পাশ্চাত্য দেশ সমূহের শাসনতন্ত্রগুলিকে নিজ নিজ দেশের ব্যবসায়ীদের রক্ষা ও সাহায্যার্থ নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। এই প্রকার চেষ্টা প্রধানতঃ চলিয়াছে তিন উপায়ে—প্রথমতঃ, যাহারা বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট সরকারী তহবিল হইতে অর্থসাহায্য (Subsidy) করিতেছেন। এই অর্থসাহায্যের ফলে কারবারের মালিকগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে তাহাদের পণ্য বাজারে দিতে পারিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশ হইতে আমদানী মাল যাহাতে সস্তায় বিকাইতে না পারে তজ্জন্য তাহার উপর কর (Tariff duty) ধার্য্য করা হইতেছে। এই দুই উপায় দ্বারাও যখন সুবিধা হইতেছে না, তখন অস্বাভাবিক উপায়ে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া অন্য দেশ

অপেক্ষা জিনিষের দর (টাকার মাপে) কমাইবার চেষ্টা চলিয়াছে। এই নীতি অনুসরণ করিয়াই ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মাণী ও জাপান প্রভৃতি অনেক দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়াছে। যে স্বর্ণমানকে ভিত্তি করিয়া বিশ্বব্যাপী আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য একদিন গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহার উপর সমস্ত পৃথিবীর আর্থিক ব্যবস্থা একদিন নির্ভর করিত, সেই মূলনীতির পরিহার, আর্থিক ও ব্যবসা জগতে যে কত বড় ওলট-পালট ও অস্থিরতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বলিবার নহে। বিগত মহাসমরের সময় জাতির ও দেশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যখন লোপ পাইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছিল তখন যুদ্ধলিপ্ত দেশসমূহ প্রাণের দায়ে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া অর্থের নামে কাগজ চালাইতে একবার বাধ্য হইয়াছিল সত্য। কিন্তু শান্তির সময়েও পুনরায় স্বর্ণমান পরিত্যাগ করায় ইহাদের সমস্যা যে আজ কতদূর গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে তাহা আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। কিন্তু এত করিয়াও শেষরক্ষা হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। কারণ প্রত্যেক বুদ্ধিমান জাতিই যদি পরের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার চেষ্টা করে—তাহা হইলে কাহারও ভাগ্যেই কাঁঠাল ভোজন সম্ভব হইতে পারে না। তাই আজ পরস্পরবিরোধী আত্মঘাতী নীতির ফলে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য অসাড় হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্যার জবাব আজ য়ুরোপ ও আমেরিকার ধনী সমাজ খুঁজিয়া পাইতেছে না; শুধু অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে।

ইহার জবাব দিবার চেষ্টা করিতেছে আজ সোভিয়েট রুশিয়া। এই চেষ্টা যেমনই বিরাট তেমনই অভিনব। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও কর্ম্মবীর লেনিন দেখিলেন, পৃথিবীর একদল লোক সারাদিন খাটিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টি করে; আর

একদল লোক তাহা ভোগ করে। একদল রিক্ত, বঞ্চিত ও নিঃস্ব; মুষ্টিমেয় আর একদল তাহাদেরই সৃষ্ট ঐশ্বর্য্যে ধনী ও বিলাসী। একমাত্র ক্ষমতা ও যোগ্যতার দোহাই দিয়া পৃথিবীর এই বৈষম্যকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। ধনীর অতিরিক্ত স্বার্থপরতা, চরম ভোগলিপ্সা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনাধিকার জগতের অধিকাংশ মানবকে তাহাদের নিতান্ত সাধারণ ও ন্যায্য সুখস্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ধনী তাহার ভোগের সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না। দিনের পর দিন ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা বিনা প্রয়োজনে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। এই অর্থ অপরের হাতে আসিতে পারিলে তাহা তাহাদের জীবনের অতি আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইতে পারিত। তাই তিনি ও তাঁহার সমধর্ম্মাবলম্বী সহকর্ম্মীগণ স্থির করিলেন, প্রত্যেক মানুষকে তাহার শক্তি অনুযায়ী সমাজ ও দেশের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে এবং তাহার বিনিময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ সামগ্রী তাহাকে দেওয়া হইবে। ভোগের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য তিনি অর্থে রূপান্তরিত করিয়া ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে কিম্বা অধিকতর লাভের আশায় ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিবেন না। জগতে টাকা বা অর্থ নামক পদার্থটির সৃষ্টি না হইলে ধনীরা অপরকে বঞ্চিত করিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের সহজ সুযোগ লাভ করিতে পারিতেন না, ইহাও তাঁহারা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। পণ্য বিনিময়ের সুবিধার জন্যই অর্থ নামক পদার্থটির একদিন সৃষ্টি হইয়াছিল। মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার দিক দিয়া অর্থের নিজস্ব মূল্য অতি সামান্যই। প্রকৃত সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য সংগ্রহের প্রতিনিধিরূপেই ইহার যাহা কিছু মূল্য। কাগজের তৈরি "নোটের" প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার সত্যতা

আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব। কিন্তু শুধু পণ্য বিনিময়ের সুবিধার জন্য যাহার একদিন সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আজ পণ্যসম্পদকে ছাড়াইয়া উঠিয়া একটা অতিরিক্ত নিজস্ব মর্য্যাদা আপনার জন্য সঞ্চয় করিয়াছে। তাই নব্য রুশিয়ার নূতন কর্ণধার স্থির করিলেন, অর্থ নামক পদার্থটিকে বিশ্বের হাট হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে, মানুষকে সঞ্চয়ের লোভ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। কৃষিকর্ম্ম বা শিল্পবাণিজ্য করিয়া তাহা হইতে কাহারও লাভবান হওয়া ত দূরের কথা; ব্যক্তিগত ধনাধিকারই কাহারও থাকিবে না। লেনিন প্রবর্ত্তিত এই নীতির ফলে—রুশিয়ার সমস্ত কারখানা, কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য ভূসম্পত্তি, জমিজমা আজ রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিয়া আসিয়াছে। সকল ক্ষেত্রে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মূলে আজ রাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রুশিয়ার বৃহৎ সাম্রাজ্যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' রূপে রাষ্ট্রই সকলের একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা এবং স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির মালিক। নিজেদের জামা কাপড়, পড়িবার বই ও সাধারণ আসবাবপত্র ভিন্ন অন্য কিছুতে কাহারও কোন প্রকার ব্যক্তিগত অধিকার নাই। প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের কৃষি ও শিল্পোন্নতির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের সর্ব্ববিধ অভাব মোচনের ভার রাষ্ট্রই নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছে। রাজশক্তি ভিন্ন রুশিয়ায় আজ অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তি বা প্রতিষ্ঠান নাই যাহা পারিশ্রমিক দ্বারা অন্য লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইতে পারে। কাহারও পক্ষে নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কৃষি কর্ম্মের পরিচালনা করা দূরের কথা, সামান্য জিনিষ কেনাবেচা করা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। কারণ বিদেশের সহিত চালানী ব্যবসা (Export Import trade) কিম্বা দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, সবই রাষ্ট্রের

সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। কম মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিয়া বা বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া স্বল্প লাভে উহা বিক্রয় করতঃ লাভবান হইবার উপায় সে দেশে নাই। রুশিয়ার এই নূতন ব্যবস্থাকে সহজে বুঝিতে হইলে আমাদের এমন একটি দেশের কথা কল্পনা করিতে হইবে যেখানে একটিমাত্র ধনী সমগ্র দেশ জোড়া বিশাল জমিদারী ও কারখানার মালিক এবং অপর সকলে তাহার পরিবারভুক্ত। ধনতান্ত্রিক দেশের মালিকের সহিত তা'র এইটুকু মাত্র পার্থক্য—তিনি তাঁহার এই বিরাট কারবার হইতে উৎপন্ন লাভের কোন অংশ নিজে গ্রহণ করেন না; লাভের এক অংশ কৃষি ও শিল্পের বিস্তার ও উন্নতির জন্য এবং অপর অংশ যাহারা এই দেশব্যাপী অনুষ্ঠানে কৃষক, শ্রমিক ও শিল্পী হিসাবে কাজ করে—তাহাদের অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করা হয়। মালিক ও তাঁহার প্রধান পরিচালকগণ যাহা গ্রহণ করেন তাহা দ্বারা তাঁহাদের সাধারণ অভাব মোচন হয় মাত্র, বিলাসিতা করা সম্ভব হয় না।

এখানে রুশিয়ার অর্থনীতির সহিত পৃথিবীর আর সব দেশের অর্থনীতির যে গুরুতর প্রভেদ তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান সঙ্কটকাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্বর্ণের নিজস্ব একটা মূল্য আছে। কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য প্রত্যেক দেশে নোটের প্রচলন থাকিলেও সরকারী ধনাগার হইতে ইচ্ছামত নোটকে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া চলিত। সেইজন্য কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপন খুসীমত নোট ছাপাইয়া অর্থ সৃষ্টি করা চলিত না। বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসা জগতে যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে তাহার ফলে যদিও অধিকাংশ দেশ স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া নোটের বিনিময়ে নিজদেশে

স্বর্ণমুদ্রা দিবার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তথাপি নিজেদের মুদ্রার মর্য্যাদা বিশ্বের হাটে যাহাতে একেবারে বিনষ্ট হইয়া না যায় তজ্জন্য সাধ্যানুসারে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবস্থাও রাখিয়াছে। নোটের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দিবার যে আইনসঙ্গত বাধ্যবাধকতা ছিল তাহাই শুধু উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ব্যবসা-জগতে এই সব স্বর্ণ-ভ্রষ্ট মুদ্রার মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু রুশিয়ার মুদ্রা 'রুব্‌ল্'-এর অবস্থা আজ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। স্বর্ণের সহিত ইহার আজ কোনরূপ সম্পর্ক নাই।*

রুশিয়ার বাহিরে অন্যত্র ইহার কোন মূল্যও নাই; কোনরূপ মূল্য থাকে তাহা রুশিয়ার কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায়ও নয়। রুশিয়ার মুদ্রা যাহাতে বিদেশে যাইতে এবং বিদেশী মুদ্রা যাহাতে রুশিয়ায় প্রবেশ করিতে না পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এইভাবে অর্থের সঙ্কোচন ও প্রসারণ গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীনে আনা হইয়াছে। দেশের মধ্যেও অর্থের স্বাভাবিক ব্যবহার ও শক্তিকে নানা প্রকারে খর্ব্ব করা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট নিজেই দেশের সর্ব্বপ্রধান ক্রেতা এবং প্রায় একমাত্র বিক্রেতা; স্বাধীনভাবে হাটবাজারে জিনিষপত্র ক্রয় বিক্রয় সে দেশে আর নাই; সকল লোককেই সমবায় ভাণ্ডার বা সরকারী ষ্টোর হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হয়। প্রত্যেক জিনিষের মূল্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং ইচ্ছা করিলেও বেশী জিনিষ এক সাথে কেহ ক্রয় করিতে পারে না। কারণ শুধু অর্থ দ্বারা সেখানে জিনিষ সংগ্রহ করা যায়

---

* রুশিয়ার চল্‌তি অর্থের ভিতর সাড়ে তিন শত কোটি রুব্‌ল্-এর শুধু কাগজের নোট; এবং মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ কোটি রুব্‌ল্-এর ব্রঞ্জ, তামা বা রৌপ্য মুদ্রা রহিয়াছে।

না। অনেক জিনিষের জন্য প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী একখানা টিকিট বই দেওয়া হয়। মূল্যের টাকার সাথে এক একখানা টিকিট দিলে তবেই নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিষ ক্রয় করা চলে। মানুষের হাতে যাহাতে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত হইতে না পারে তজ্জন্য সাধারণের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট মাঝে মাঝে ঋণ গ্রহণ করেন। উহাতে প্রত্যেককে টাকা ধার দিতে আইনতঃ বাধ্য করা হয়। বেশী টাকা হাতে থাকিলেই প্রয়োজনের অধিক জিনিষ সংগ্রহের চেষ্টা চলিবে এবং ফলে সকলের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়াও দুষ্কর হইবে, এই উদ্দেশ্যেই অতিরিক্ত অর্থ সাধারণের হাত হইতে এই উপায়ে টানিয়া লওয়া হয়।

তাহা হইলে মোটামুটি অবস্থা এই দাঁড়াইল যে, রুশিয়ার অধিবাসীরা অর্থ থাকিলেও দেশে ইচ্ছামত জিনিষ ক্রয় করিতে পারে না। কারণ সকল জিনিষের বিক্রয়ের ভার সরকারী বিভাগের হাতে এবং তাহারা আজও যথেষ্ট পরিমাণ পণ্যসম্ভার নিজেদের দেশে প্রস্তুত করিতে পারিতেছে না বলিয়া টাকা থাকিলেও ইচ্ছামত সকলকে জিনিষ কিনিতে দেওয়া হয় না; পরিমিত পরিমাণ আবশ্যকীয় জিনিষ যাহাতে সকলে পাইতে পারে শুধু তাহারই চেষ্টা করা হয়। সেই জন্যই দেশের মধ্যেও তাহাদের অর্থের যেটুকু ক্রয় শক্তি আছে, তাহাও ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। বিদেশ হইতেও তাহারা জিনিষ ক্রয় করিয়া আনিতে পারে না। কারণ প্রথম কথা, তাঁহদের টাকা বিদেশে একেবারে অচল—শত 'রুবল্'-এর বিনিময়ে বিদেশী ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে একটি কপর্দ্দকও দিবে না বা বিদেশী দোকানদার একমুষ্টি জিনিষও বিক্রয় করিবে না। দ্বিতীয় কথা, বিদেশ হইতে জিনিষ আমদানি করিবার অধিকারও তাহাদের নাই; সেই অধিকার একমাত্র গবর্ণমেণ্টের।

এই অবস্থায় রুশিয়ার প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদের এতদিনকার পরিচিত অর্থের যে কতটা আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে এই মূল্যহীন পদার্থটাকে রাখিবার সার্থকতা কি? সার্থকতা কিছু আছে। প্রত্যেকের খাটুনির পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ করিবার জন্য কোনরূপ একটা নিদর্শনের আবশ্যক। জাহাজে মাল বোঝাই করিবার সময় যেমন প্রত্যেক কুলীর হাতে বোঝা পিছু একটি করিয়া "চাক্তি" নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া হয় 'রুবল্'এর প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতাও অনেকটা ঐরূপই। ইহাকে মজুরির টিকিট (labour ticket) মনে করিলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হইবে না। আরো একটা সার্থকতা ইহার আছে। ইহার সাহায্যে বিরাট সরকারী কাজকর্ম্মের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব রাখার সুবিধা হয়—প্রত্যেক বিভাগের বা কারখানার লাভ ক্ষতি বুঝিতে পারা যায়; কর্ম্মের শিথিলতা, ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ধরা পড়ে এবং কর্ম্মের যোগ্যতা (efficiency) পরিমাপ করা সহজ হয়। অর্থের মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানে প্রয়োজনীয় ভোগ বা বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করা নহে—স্বকল্পিত একটি মাপকাঠি দ্বারা কাজকর্ম্মের একটা হিসাব ঠিক রাখা।

এই অর্থশূন্য অর্থের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা আরও সঙ্কুচিত করিবার ব্যবস্থা চলিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের বাসের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বড় বড় গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে; উহাতে আধুনিক ফ্যাসনের ফ্ল্যাট থাকিবে। একই কারখানার বা স্থানের কর্ম্মী ও শ্রমিকগণ ঐ সব ফ্ল্যাটে থাকিতে পারিবে এবং তৎসংলগ্ন সাধারণ ভোজনাগারে আহার পাইবে। এতদ্‌ভিন্ন বৈদ্যুতিক আলো, আগুন ও অন্যান্য

প্রয়োজনীয় জিনিষও সকলকে সরবরাহ করা হইবে। পড়িবার জন্য পাঠাগার, অবকাশরঞ্জনের জন্য ক্লাবগৃহ, শিশুদের জন্য নার্সারি—সব বন্দোবস্তই তাহাতে থাকিবে। বড় বড় কারখানায় এই সব বন্দোবস্ত ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। অর্থের বিনিময়ে মজুরি বাবদ প্রত্যেকে এক একখানা সেভিংব্যাঙ্কের বইমাত্র পাইবে। উহাতেই মজুরী বা মাহিনা জমা হইবে এবং উহা হইতেই কর্তৃপক্ষ এই সব খরচের টাকা কাটিয়া লইবেন। এই ব্যবস্থা সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করিলে রুশিয়ার অধিবাসিগণকে আর টাকার মুখ দেখিতে হইবে না—হিসাবের খাতাতেই তখন তাহার একমাত্র স্থান হইবে।

সাধারণ পাঠকের মনে এই প্রশ্নও জাগিতে পারে, বিনা অর্থে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমগ্র দেশের কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পবাণিজ্য পরিচালনা করা কি প্রকারে সম্ভব? আধুনিক উপায়ে ইহাদের উন্নতি সাধন করিতে হইলে অনুন্নত রুশিয়াকে অন্ততঃ কিছু কাল বিদেশ হইতে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য অনেক জিনিষ আমদানী করিতেই হইবে। তাহার মূল্য সে দিবে কি করিয়া? আর যে ব্যাপার সে ফাঁদিয়া বসিয়াছে, সে ব্যাপার ত সামান্য বা সাধারণ নহে, একটা বিরাট অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যে দেশ শিক্ষাদীক্ষায়, শিল্পবাণিজ্যে, কৃষিকর্ম্মে—সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের মতই দীনতা ও হীনতার গভীর পঙ্কে ডুবিয়া বিশ্বের করুণার পাত্র হইয়া ছিল, তাহাকে আজ সর্ব্ববিষয়ে অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সমকক্ষ করিয়া ত তুলিতেই হইবে; অধিকন্তু ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য মোচন করিয়া সকলকে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দিতে হইবে। তাই বিরাট এক কর্ম্মতালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া সমগ্র দেশ একদিল হইয়া কর্ম্মে লাগিয়া গিয়াছে। প্রথম পঞ্চম বার্ষিক প্ল্যানের নির্দ্ধারিত অনেক কর্ম্ম সময়ের পূর্ব্বেই সম্পন্ন

হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় অধ্যায় চলিয়াছে। যেরূপ সামরিক রীতি ও শৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয় ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই এই প্ল্যানের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মও সম্পন্ন হইয়া যাইবে। সনাতনী পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা রুশিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ মস্তক কণ্ডূয়ন করিয়া ভাবিতে সুরু করিয়াছেন, "তাই ত! টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, চাকরি নোকরি কিছুরই ভাবনা ইহারা ভাবিতেছে না! তবে কি আমাদের সকলের উপর টেক্কা দিয়া সত্য সত্যই ইহারা একটা নূতন রকম মানব-সভ্যতার সৃষ্টি করিবে না কি!"

মূল প্রশ্নের উত্তর এখনো আমাদের দেওয়া হয় নাই। আমাদের প্রশ্ন,—যে দেশে টাকা নাই, যে রাজকোষ স্বর্ণশূন্য, সেখানে এ-সব রাজসূয় যজ্ঞের খরচ আসিবে কোথা হইতে? প্রথম কথা, খরচের জন্য দেশে তাহার অর্থের দরকার হয় না। সাধারণের দ্বারা কাজ করাইয়া লইয়া তাহাদিগকে তাহাদের জীবন-ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিলেই চলে। কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যকীয় যে-সব জিনিষ দেশের মধ্যে ক্রয় করিতে হয় তাহার মূল্যও "অপদার্থ" অর্থ দ্বারাই দেওয়া চলে। কারণ সব প্রতিষ্ঠান, সব কলকারখানাই যখন গবর্ণমেণ্টের এবং গবর্ণমেণ্টই যখন সকল জিনিষের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তখন এক বিভাগের প্রয়োজনীয় জিনিষ আর এক বিভাগ হইতে ক্রয় করা অর্থ—হিসাবে জমা-খরচ করিয়া লওয়া এবং ইহাও করা হয় শুধু প্রত্যেক বিভাগের বা কারবারের অবস্থা বুঝিবার সুবিধার জন্য বা একটা হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য।

দেশের দেনা পাওনা সম্বন্ধে না হয় এ ভাবে কাজ চলিল। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানী জিনিষের মূল্য দিবার কি হইবে? স্বর্ণমুদ্রা

(gold coin) বা স্বর্ণখান (gold bar) তাহার নাই, যাহা দ্বারা সে বিদেশের দেনা শোধ দিতে পারে। তাই যে পরিমাণ পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিলে উহার মূল্য দ্বারা বিদেশী দেনা বিদেশী অর্থে পরিশোধ করা চলে, সেই পরিমাণ পণ্যই সে বিদেশে চালান করে। বাণিজ্যের গতি (Balance of Trade) তাহার অনুকূলে রাখিবার জন্য বা ধনাগমের জন্য বিদেশে পণ্য পাঠাইবার তার আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, রুশিয়ার নব্যশাস্ত্রে অর্থের স্থান নাই, অর্থের কোন প্রয়োজন নাই। তার প্রয়োজন পণ্যসম্পদের এবং সেই পণ্যসম্পদ সে নিজ দেশেই সৃষ্টি করিতে চায় দেশের লোকের সাহায্যে। বিদেশ হইতে নিতান্ত যাহা না আনিলে নয় তাহাই সে আনে। এবং তাহা ভোগের বা ব্যবহারের জিনিষ নহে, কৃষির উন্নতির বা নব নব শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি, যাহা আজো সে নিজ দেশে তৈরি করিয়া উঠিতে পারে নাই।

মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। জিনিষ প্রস্তুত করিতে তাহার টাকা লাগে নাই। তাই বিদেশী দেনা পরিশোধের জন্য বিদেশের হাটে জিনিষ বিক্রয় করিবার সময় মূল্য সম্বন্ধে তাহাকে অতটা হিসাব করিয়া চলিতে হয় না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অন্য দেশ অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা তাহার পক্ষে সহজ; কারণ লাভ ক্ষতি তাহার টাকা দিয়া পরিমাপ করিবার প্রয়োজন হয় না—জিনিষের পরিমাণ দিয়া মাপ করিতে হয়। অবশ্য মূল্যের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত কম জিনিষ দিতে পারিলে অতিরিক্ত জিনিষটা তাহার দেশের প্রয়োজনে আসিতে পারে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিলাম,

রুশিয়ার গবর্ণমেণ্ট দেশের নৈসর্গিক সম্পদকে আহরণ ও ভোগ-ঐশ্বর্য্যে রূপান্তরিত করিয়া নিজ হাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহাদের প্রয়োজনমত বণ্টন করিয়া দেন। প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে শুধু খাটিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। পণ্যসম্ভার প্রস্তুত হয় সেখানে, মানুষের ভোগের জন্য, অর্থ দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য নহে। তাই ১৯২৯ সালের পর হইতে বিশ্বব্যাপী ব্যবসামন্দা ও অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে, পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের পণ্যোৎপাদন হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও রুশিয়ার পণ্যোৎপাদন অসম্ভব রকম বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজের পণ্য বিক্রয় সমস্যা তাহার নাই। তাহাদের মত পণ্যের মূল্য লইয়া তাহাকে মাথা ঘামাইতে হয় না। অর্থের সঙ্কোচন বা প্রসারণ (currency contraction and inflation) মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাইয়া তাহাকে বিব্রত করিতে পারে না; কারণ সেখানে সব জিনিষের মূল্য গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। বিশ্বের হাটে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইবার ভয়ে নানারূপ বাঁকা পথ তাহাকে অবলম্বন করিতে হয় না। সস্তায় কাঁচা মাল সংগ্রহ ও সহজে তৈরী মাল বিক্রয়ের সুবিধার জন্য দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতির উদ্ধারের গুরু দায়িত্ব তাহাকে গ্রহণ ও বহন করিতে হয় না। পৃথিবীর স্বর্ণ-তহবিলের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকিয়া নির্ধন জগৎবাসীর নিকট স্বর্ণের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয়ের ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রয়াস তাহাকে করিতে হয় না। বাণিজ্যের গতি (Balance of trade) অনুকূলে রাখিবার জন্য ফন্দি-ফিকিরের বালাই তাহার নাই। চোখ মুখ বুজিয়া জিনিষ প্রস্তুত করিয়া যাওয়াই তাহার কাজ। খরচ কি পড়িল সে ভাবনা তাহার নাই। কাজের দোষ-গুণ বিচার—ব্যয়ের হিসাব দ্বারা সে করে না; কত অল্প সময়ে কে কত বেশী জিনিষ তৈরী

করিতে পারে তাহা দ্বারা এবং জিনিষের দোষ-গুণ দ্বারা সে তাহার বিচার করে। দেশে কৃষি ও শিল্পের যতই উন্নতি সাধিত হইবে, যতই অধিক ভোগ-সামগ্রী দেশে প্রস্তুত হইতে থাকিবে, ততই তাহা অধিকতর পরিমাণে দেশের লোকের ভোগে আসিবে, তাহাদের জীবন-যাত্রার শ্রীবৃদ্ধি করিবে। রুশিয়া বিরাট দেশ, মহাদেশ বলিলেও চলে। তাহার আয়তন আশী লক্ষ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় সতের কোটি। এই বিশাল মানবগোষ্ঠীর সকল অভাব মিটাইবার মত আয়োজন করিতে তাহার আরো বহু বৎসর লাগিবে। তাই রুশিয়া দিবারাত্রি সমস্ত লোককে কাজে লাগাইয়াও পণ্য জোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না; আর অন্যান্য দেশের উৎপন্ন পণ্য ভূতের বোঝার মত তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। ইহার কারণ, অন্য দেশ জিনিষ তৈরী করে স্বর্ণের বিনিময়ে দেশে বা বিদেশে বিক্রয় করিবে বলিয়া; রুশিয়া জিনিষ তৈরী করে নিজের দেশের ভোগের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে। যেদিন রুশিয়া তাহার দেশের সমস্ত লোকের সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবে, সেইদিন সে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে এবং সেইদিন পৃথিবীর এই নূতন সাধনা পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিবে।

রুশিয়ার নব্য তন্ত্রের কথা যত সহজে বলা হইল, কার্য্যতঃ তত সহজে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিপ্লবের এক ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া রুশিয়াকে বিগত পঞ্চদশ বর্ষ চলিতে হইয়াছে। জার-তন্ত্রের মূলোচ্ছেদের পর ভিতরের ও বাহিরের শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র হইতে তাহাকে সতর্ক পাহারায় আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইয়াছে। "আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার জমি" মানবের এই চিরন্তন শাশ্বত বাসনার মূলোচ্ছেদ, যুগ-যুগান্তের সংস্কারের পরিবর্ত্তন ভাল কথায় মুখের উপদেশে শুধু

হয় নাই। তাহা সাধন করিতে দেশে রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। চিকিৎসকের অস্ত্র নির্দ্দয়রূপে দেশের বুকের উপর দিয়া পরিচালিত হইয়াছে। সম্পত্তির অধিকার তো লোপ করা হইয়াছেই, ব্যষ্টির স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের অধিকার ও জনমতকে নিষ্ঠুররূপে দলিত পিষিত করা হইয়াছে। পুরাতন সমস্ত ব্যবস্থাকে এরূপ নির্ম্মমভাবে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া, সেই বিশৃঙ্খল ধ্বংস স্তূপের উপর রাতারাতি নূতন সৌধ নির্ম্মাণ করা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। তাই নিতান্ত অপ্রতুল আয়োজন লইয়া এরূপ বৃহৎ দেশের এতগুলি লোকের ব্যবস্থা নিজ হাতে করিতে যাইয়া রুশিয়ার নব্য দলকে বেগ পাইতে হইয়াছে কল্পনাতীত এবং দেশের লোককে ভুগিতে হইয়াছে মর্ম্মান্তিক। তার উপর জমিজমা এবং গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু সব সরকারের হাতে চলিয়া যাইবে শুনিয়া কৃষক-সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদ্রোহ করিয়া, নিজেদের গৃহপালিত প্রাণীগুলিকে এক ধার হইতে হত্যা করিয়া, এবং চাষের জমি চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া ইহারা এক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল, চারিদিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে কেহই পেট ভরিয়া খাইতে পাইল না, ভীষণ শীতে তাহাদের গরম কাপড় বা পাদুকা জুটিল না। জীবন যাপনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য সরকারি ষ্টোরের সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারি বাধিয়া ধর্ন্না দিয়াও বিফল হইয়া ফিরিতে হইল। তখন রুশিয়ার রাজধানী লেনিনগ্রাডের মত সহরে (লেনিনের নামে রাজধানীর নামকরণ হইয়াছে) বিদেশী পর্য্যটক পর্য্যন্ত যথেচ্ছ অর্থের লোভ দেখাইয়াও ভাল হোটেলে পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। এত বড় দেশের কোথাও সাজ পোষাক

বিলাসিতা বা আনন্দোৎসব ছিল না। হতাশার সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ছিল শুধু একদল একনিষ্ঠ জীবন-মরণ-পণ করা কর্ম্মীর অটুট সঙ্কল্প ও নব আদর্শে অনুপ্রাণিত তাহাদের কর্ম্মসাধনা। আজও রুশিয়া বিঘ্নসঙ্কুল, কণ্টকাকীর্ণ গহন বনের আঁধার পথ পার হইয়া নিশ্চিত সফলতার রম্য উপত্যকায় পৌঁছিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার কর্ম্মীদের প্রাণপাত করা সংগ্রাম ও চেষ্টা অভীষ্ট গন্তব্য স্থলের দিকে দেশকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে—নিঃসন্দেহ। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে দেশের চেহারা অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারীগণও আজ স্বীকার করিতেছেন। শতকরা মাত্র দশজনের যেখানে বর্ণ-পরিচয় ছিল, সেখানে আজ ৯০।৯৫ জন লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। খাইবার, পরিবার, থাকিবার ব্যবস্থার অনেকখানি উন্নতি সাধিত হইয়াছে, পোষাক পরিচ্ছদের বাহার আজকাল রাস্তা ঘাটে খানিকটা পুনঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; ভোজনাগারে আহারের সহিত নাচ ও ব্যাণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে; থিয়েটার সিনেমায় লোকের ভিড় হইতে সুরু হইয়াছে। অবশ্য আজও তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর স্তর (ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব্ লিভিং) য়ুরোপ ও আমেরিকার চাইতে অনেক নিম্নে। কিন্তু যে পথে রুশিয়া চলিয়াছে—সে পথে যদি সে এ ভাবেও চলিতে পারে, নূতন বাধার আর সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সে একদিন সকলকে ছাড়াইয়া যাইবে ইহা বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। অবশ্য একদল বলিতেছেন, সমাজ বিধানের এই নূতন শাস্ত্র, নূতন তন্ত্র রুশিয়ার জনসাধারণ আজ মাথা পাতিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং সেই জন্যই ভবিষ্যতের রঙ্গীন আশায় বর্ত্তমান দুঃখ বেদনা সমস্ত নিঃশব্দে, এমন কি সানন্দে সহ্য করিতেছে। আবার আর একদল বলিতেছেন, নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ দ্বারা দেশের উপর যে

নূতন ব্যবস্থা চালান হইতেছে, লেনিন বা ষ্টেলিনের ন্যায় অতি মানবের তিরোধান হইলেই তাসের খেলা-ঘরের ন্যায় সব ধূলিসাৎ হইবে। একটা দেশের সমগ্র অধিবাসীকে তাহাদের মতের বিরুদ্ধে জোর করিয়া কিছুদিন পরিচালনা করা যাইতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ দিন বা চিরদিন তাহা চলিতে পারে না। এরূপ যাঁহারা বলিতেছিলেন তাঁহাদের প্রায় আশা-ভঙ্গ হইবার মত অবস্থা হইয়াছে। যাহা হউক, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তাহা এখনো বলা কঠিন; তবে এ কথা ঠিক, রুশিয়ার এই নূতন সমাজ-গঠন-প্রচেষ্টা জগতের অষ্টম আশ্চর্য্যরূপে গণ্য হইতে পারে এবং উহার সফলতা বা বিফলতার উপর ধনী-নির্ধনের সম্বন্ধ, মানবের ভবিষ্য-সমাজের রূপ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

অর্থ ও ঐশ্বর্য্য

বর্ত্তমান অর্থনীতিকগণের মতে জগতের প্রধান সমস্যা কৃষি ও শিল্প-সম্পদ সৃষ্টি করা নহে, উহা বিক্রয় করা। এক দিকে এ কথা যেমন তাঁহারা বলেন না যে, নিখিল মানবের অভাব আজ সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইয়া গিয়াছে—মানুষের ভোগের জন্য আর অধিক পণ্যসম্পদ প্রস্তুতের প্রয়োজন নাই, তেমনি অন্যদিকে এ কথাও তাঁহারা বলেন না যে, বিশ্বের সকল নৈসর্গিক সম্পদ আহরণ ও সৃষ্টির কাজ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মতে সমস্যা হইতেছে এই যে, যতটুকু আয়োজন করা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ বা ভোগ করিবার শক্তি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের নাই। একদিকে কলকারখানা, শিল্পী ও মজুর অলস হইয়া বসিয়া আছে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাহা বিক্রয় হইতেছে না; অন্যদিকে অধিকাংশ মানবের অধিকাংশ অভাব অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে। তাই আমাদের মনে আজ স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন জাগিতে পারে,—অর্থের অভাব হইতেই যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বিপদগ্রস্ত ও বর্ত্তমান সমস্যার উৎপত্তি এবং ইচ্ছা করিলেই যখন কর্ত্তৃপক্ষ অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে ও কমাইতে পারেন, তখন অতিরিক্ত অর্থসৃষ্টি করিয়া এই ক্রয়শক্তি মানুষের হাতে দিতে কি বাধা আছে? অর্থশাস্ত্রের পক্ষ হইতে সেই প্রশ্নের জবাব বর্ত্তমান প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করিব।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, সত্যই কি অতিরিক্ত অর্থ ইচ্ছা করিলেই আমরা সৃষ্টি করিতে পারি? হাঁ, পারি। কি প্রকারে বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে অর্থ বলিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচলিত ধাতব মুদ্রা বা

নোটই শুধু বুঝায় না—মানুষের যে টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে, চেক্ দ্বারা আমরা যাহা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাকেও বুঝায়। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ যখন ধাতব মুদ্রা বা নোট ভিন্ন অন্য কোন জিনিষ নহে, তখন উহাকে পৃথক্ করিয়া আমরা কেন দেখিব, এই প্রশ্নও আমাদের মনে আসিতে পারে। ইহার সহজ উত্তর এই যে, আমরা ব্যাঙ্কের টাকার বিনিময়ে চেক্ দ্বারা যখন আমাদের দেনা-পাওনা মিটাই, তখন একটি চেক্ই দশ হাত ঘুরিয়া দশটি পাওনাদারের দাবী মিটাইতে সক্ষম হয় এবং মধ্যস্থ নয়টি ব্যক্তির ব্যাঙ্ক-গচ্ছিত অর্থের কোনরূপ ব্যবহার করিবার প্রয়োজনই হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে চেক টাকার কাজই সম্পন্ন করে বলিয়া ইহাকে অর্থরূপেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার আর একটি কারণ আছে। ব্যাঙ্কের সহিত যাঁহার অনেকদিনের কারবার কিংবা ব্যবসা-জগতে যাঁহার সুনাম ও মর্য্যাদা আছে, এমন ব্যক্তিকে প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক অনেক সময় শুধু বিশ্বাসের উপর কিংবা কারখানা ও তাহার উৎপন্ন পণ্য বন্ধক রাখিয়া কিংবা অন্য কোনরূপ নির্ভরযোগ্য জামিন লইয়া টাকা ধার দিয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Credit বলা হয়। যে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিতেছে, সেই ব্যাঙ্কের নিজের যদিও এই টাকা নহে এবং যে ব্যক্তি টাকাটা লইতেছে, তাহারও ইহা নহে, তথাপি ব্যাঙ্কে অপরের গচ্ছিত অব্যবহৃত অর্থ হইতেই ইহার সৃষ্টি। সেই জন্যই ব্যাঙ্ক-ডিপোজিট ও ক্রেডিট উভয়েই অর্থের স্বগোত্র। এই ধার বা ক্রেডিট আধুনিক ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে। কারণ কাহাকে কত টাকা ধার দেওয়া হইবে ইহা ব্যাঙ্কেরই সম্পূর্ণ বিবেচনাধীন ; এবং ব্যাঙ্ক ঋণদানের পরিমাণ নিজেদের নিরাপত্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদাই বাড়াইতেছে ও কমাইতেছে।

তার পর ব্যাঙ্ক-নোটের কথা ধরা যাক। নোট-প্রচলনের অধিকার প্রত্যেক দেশের শুধু কেন্দ্রীয় (Central) ব্যাঙ্কের উপরই ন্যস্ত আছে। সঞ্চিত স্বর্ণ-তহবিলের অনুপাতে নোটসংখ্যার পরিমাণ আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সেই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে নোটের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে পারে। এমন কি, বিশেষ প্রয়োজনের সময় নির্দ্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত নোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে চালাইয়া থাকেন। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ায়, স্বর্ণতহবিলের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া নোটসৃষ্টির প্রয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছিল। ১৯৩২ সালের পর অধিকাংশ দেশ কর্ত্তৃক স্বর্ণমান পুনঃ পরিত্যক্ত হওয়ায় আবার সেই অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দেশের কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক নোটের ও ঋণদানের পরিমাণ ইচ্ছা করিলে বৃদ্ধি করিতে এবং এই উপায়ে নূতন অর্থের বা ক্রয়শক্তির সৃষ্টি করিতে পারে।

এখন মূল প্রশ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক। যদি ভোজ্যও প্রচুর হয় এবং ভোক্তারও অভাব না থাকে এবং যদি কেবল অর্থের অভাবেই মানুষ তাহার অভাব পূরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে উল্লিখিত উপায়ে নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান অবস্থাসঙ্কট দূর করিতে কি বাধা আছে? ইহার জবাবের জন্য আমাদিগকে বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রের একটি কুহেলিকাচ্ছন্ন কূটতত্ত্বের অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইবে। ইংরেজীতে ইহাকে Quantity Theory of Money বলা হয়। আমরা বাঙ্গালায় ইহার নামাকরণ করিতে পারি—টাকার সংখ্যাতত্ত্ব।

রামের অর্থ বাড়িলে তাহার ঐশ্বর্য্য বাড়িবে, তাহার দৈহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভের পথ সুগম হইবে এ কথা ঠিক। রহিম, করিম, যদু, মধুর অর্থ বাড়িলে তাহাদেরও দিন ফিরিবে, ইহাও সত্য। কিন্তু

প্রত্যেকের অর্থ বৃদ্ধি পাইলে, দেশের মোট অর্থের পরিমাণ বাড়িলে, সকলের অবস্থার অনুরূপ উন্নতিলাভ হইবে কিনা এখন ইহাই প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে টাকার সংখ্যা তত্ত্বের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে।

এই তত্ত্বের সার কথা এই যে, জিনিষের মূল্য প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে দেশ-বিদেশের পণ্য ও অর্থের মোট সমষ্টির উপর। কোন দেশের জিনিষের মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে, আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে, একদিকে সেই দেশের বিক্রয় ও হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের মোট পরিমাণ বা সংখ্যা—অন্যদিকে অর্থের মোট সমষ্টি। যদি জিনিষের সংখ্যা এক শত ও টাকার সংখ্যা দুই শত হয়, তাহা হইলে গড়পরতা প্রত্যেকটি জিনিষের মূল্য দুই টাকা হইবে। কিন্তু যদি জিনিষের সংখ্যা সমান থাকিয়া টাকার সংখ্যা কমিয়া একশত বা বাড়িয়া তিন শত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি জিনিষের মূল্য যথাক্রমে এক টাকা ও তিন টাকা হইবে। পক্ষান্তরে টাকার সংখ্যা সমান থাকিয়া জিনিষের সংখ্যা কমিলে বা বাড়িলেও জিনিষের মূল্য এই ভাবেই বাড়িবে বা কমিবে। মানুষের অভাব-মোচনের জন্যই অর্থের প্রয়োজন—সঞ্চয়ের জন্য নহে। সুতরাং যাবতীয় অর্থ যাবতীয় ভোগসামগ্রী সংগ্রহের জন্যই ব্যয়িত হইবে, এই ধারণাই এই নীতির মূলে কাজ করিতেছে।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া যদি টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে পণ্যের মূল্যই শুধু ঐ হারে বৃদ্ধি পাইবে; কিন্তু লোকের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বাড়িবে না। কারণ অতিরিক্ত সমস্ত টাকাটাই অতিরিক্ত মূল্য দিতে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকা দ্বারা পরিবার-প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহার আয় দেড়শত

টাকা হইলেও তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। প্রত্যেকটি জিনিষের জন্য সে শুধু তিন গুণ মূল্যই দিবে—কিন্তু একটি অতিরিক্ত ভোগ-সামগ্রী তাহার ভাগ্যে জুটিবে না। ইহাই হইল সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের মত।

কিন্তু এই মত নব্যতন্ত্রীরা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, নূতন অর্থ সৃষ্টি করিলে পণ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে; আর পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উহার মূল্য চড়িতে পারিবে না। পণ্যের মূল্য যদি চড়িতে না পায়, তাহা হইলে অধিকসংখ্যক পণ্য মানুষের ভোগে লাগিবে এবং দেশের সম্পদ ও মানুষের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বাড়িবে।

এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে সত্য কোথায় তাহাই এখন দেখা যাক। প্রত্যেক দেশে একদল লোক অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্য-সম্পদ সৃষ্টি করে উহা বিক্রয় করিবার জন্য; আর একদল লোক অর্থদ্বারা উহা ক্রয় করে ভোগ করিবে বলিয়া। অর্থের এক প্রয়োজন, মানুষের নিত্যব্যবহার্য্য জীবনধারণোপযোগী পণ্যোৎপাদনের ভূমি, যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার জন্য; দ্বিতীয় প্রয়োজন, ঐ সব ভূমি ও কলকারখানাজাত পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য। প্রথমোক্ত জিনিষগুলিকে মূলবস্তু বা Capital Goods বলা হয়। শেষোক্ত জিনিষগুলিকে ভোগ্যবস্তু বা Consumer's Goods বলা হয়। অতিরিক্ত অর্থসৃষ্টির সঙ্গে ভোগের জিনিষের মূল্য সেই অবস্থাতেই বাড়িয়া চলিতে পারে, যে-অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থসমষ্টি নূতন পণ্য সৃষ্টির কাজে না লাগিয়া শুধু পণ্যভোগীদের কাজে লাগিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা আবার তখনই ঘটা সম্ভব, যখন দেশের সকল কল-কারখানাই পূরাদমে পণ্যোৎপাদন করিয়া চলিয়াছে, কোন শিল্পী, শ্রমিক বা কৃষক বসিয়া

নাই। সেই অবস্থায় যে অতিরিক্ত অর্থের সৃষ্টি হয়, নূতন শিল্প বা পণ্য-নির্ম্মাণের কাজে তাহা ব্যয়িত হইবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া, ঐ টাকার সবটাই পণ্য-ক্রেতাদের হাতে যাইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই অর্থের সমষ্টি দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলে জিনিষের মূল্যও দ্বিগুণ বা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কিন্তু যদি দেশের পণ্যোৎপাদক কলকারখানাগুলি অর্থের অভাবে পুরা দমে কাজ করিতে না পারে, কিংবা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাব-বশতঃ নূতন কলকারখানার সৃষ্টি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সুবিবেচনার সহিত হিসাব করিয়া এই অতিরিক্ত অর্থ এই সব ব্যবসায়ীকে ধার দিলে, দেশে নূতন পণ্য-সম্পদ সৃষ্টি হইতে পারে এবং এই অর্থ পণ্যভোগীদের হাতে না পড়িয়া শিল্পীদের হাতে পড়ায় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি না পাইয়া দেশের প্রকৃত সম্পদ বাড়িতে পায়। উপরোক্ত অবস্থায় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না, যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ মনে হইলেও, কার্য্যতঃ কিন্তু ঠিক তাহা ঘটিতে পারে না। কি প্রকারে তাহা আর একটু খোলসা করিয়া বলিতেছি।

অতিরিক্ত টাকার কোন অংশই যদি ব্যাঙ্ক ক্রেতাগণকে ধার না দিয়া তার সমস্তটাই কলকারখানার মালিকগণকে ধার দেয়, তাহা হইলেও মজুরী ইত্যাদি বাবদ এই টাকার খানিকটা পণ্য-ভোগীদের হাতে যাইয়া পড়িবে এবং অবশিষ্ট টাকা নূতন পণ্য-সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হইলেও, নূতন জিনিষ তৈরী হইয়া বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিতে স্বভাবতঃই কিছু বিলম্ব ঘটিবে। নূতন পণ্যের সৃষ্টি হইতে কিছু সময় লাগিবে, অথচ ইতিমধ্যে কিছু টাকা নূতন কল-কারখানার মারফতে পণ্য-ভোগীদের হাতে আসিয়া যাইবে। ফলে নূতন টাকার

সবটাই পণ্যোৎপাদকগণকে ধার দেওয়া সত্ত্বেও জিনিষের মূল্য খানিকটা চড়িয়া যাইবে। তবে এ কথাও ঠিক যে, যদি ব্যাঙ্ক অনির্দ্দিষ্ট কাল এই অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি করিয়া না চলে, তাহা হইলে কিছু দিন পরে নূতন পণ্যসম্ভার যখন বাজারে উপস্থিত হইবে, তখন জিনিষের মূল্য স্বাভাবিক নিয়মে পুনরায় হ্রাস পাইতে থাকিবে।

দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। জিনিষের ও টাকার উভয়ের সমষ্টি একশত হইলে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য হইবে এক টাকা। কিন্তু যদি নোট বা ক্রেডিট সাহায্যে আরও একশত টাকা সৃষ্টি করা যায় এবং তাহার পঞ্চাশটি নূতন পণ্যোৎপাদনের জন্য মূলধনরূপে ব্যয়িত হয় এবং অপর পঞ্চাশটি মজুরী ইত্যাদি দিবার জন্য ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত নূতন পণ্য সৃষ্টি হইয়া বাজারে না আসিতেছে, সেই পর্য্যন্ত অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে : জিনিষের সমষ্টি একশত, টাকার সমষ্টি দেড়-শত, জিনিষের মূল্য দেড় টাকা। কিন্তু যখন অতিরিক্ত পঞ্চাশ টাকা মূলধনের সাহায্যে আরও পঞ্চাশটি জিনিষ যথাকালে বাজারে উপস্থিত হইবে, তখন অবস্থা হইবে এইরূপ : জিনিষের সমষ্টি দেড়শত, টাকার সমষ্টি দেড়শত এবং জিনিষের মূল্য একটাকা। অর্থের অনুপাতে পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে পুনরায় মূল্যের হ্রাস ঘটিবে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান দুনিয়ায় যখন নূতন সম্পদ সৃষ্টির আয়োজন এবং প্রয়োজন রহিয়াছে, তখন নূতন অর্থ বা ক্রয়-শক্তি সৃষ্টি করিলে জিনিষের মূল্য শুধু না বাড়িয়া জিনিষের সংখ্যা ও কাট্‌তি উভয়ই বাড়িতে পারে। ইহাই ত সর্ব্বজনবাঞ্ছিত লক্ষ্য।

কিন্তু উল্লিখিত লক্ষ্যে পৌছিতে হইলে এই অর্থ-প্রসারণ নীতি (Policy of Inflation) অতিশয় সাবধানতার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণকে দেখিতে হইবে যে, অতিরিক্ত-

অর্থ ধার দিবার সময় উহা কল-কারখানার মালিকগণ পায় এবং উহা ষ্টক্ ও শেয়ার-স্পেকুলেটারের হাতে গিয়া না পড়ে। তৎপর নূতন নোট ও ক্রেডিটের পরিমাণ আস্তে আস্তে হ্রাস করিয়া আনিয়া এমন ভাবে তাহা বন্ধ করিতে হইবে, যাহাতে অতিরিক্ত অর্থদ্বারা নূতন অতিরিক্ত জিনিষের মূল্যই শুধু পোষাইয়া যায়। তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইবে, অধিকতর পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইবে; অথচ জিনিষের মূল্য সাময়িক ভাবে কিছুটা বাড়িলেও মোটামুটি স্থিরই থাকিবে। সম্প্রসারণ নীতির যাঁহারা পক্ষপাতী, অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যাঁহারা বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি ও ব্যবসায়-মন্দা দূর করিতে চান, সেই সব নব্যপন্থী পণ্ডিতদের ইহাই অভিমত।

কিন্তু সনাতন-পন্থীরা অজানা পথে নামিতে এত সহজে রাজী নন। তাঁহারা বলেন, বিক্রয়যোগ্য জিনিষের সংখ্যা নিরূপণ করা, চলতি টাকার সমষ্টির নির্দ্দেশ করা, উহার গতিশীলতা (velocity of circulation) নির্দ্ধারণ করা এতই দুরূহ ব্যাপার যে, এই সব তথ্য ঠিক মত পরিজ্ঞাত হইয়া ইহাদিগকে আয়ত্তাধীনে রাখিয়া সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে মাপিয়া অর্থের সম্প্রসারণ-নীতি প্রয়োগ করা একপ্রকার অসম্ভব। নূতন অর্থ সৃষ্টি দ্বারা নূতন পণ্য তৈয়ার ও বিক্রয় করা, কাহারও ইচ্ছাধীন হইতে পারে না। কেবল অর্থ সৃষ্টি দ্বারাই জগতে নূতন ব্যবসায়-বাণিজ্যের পত্তন সম্ভব নয়। ইহার মূলে মানুষের কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য, প্রয়োজনের তাগিদ ও আরও কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়ম অদৃশ্য থাকিয়া কাজ করিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও মানুষের কাজ-কর্ম্মের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা ঐ সব অদৃশ্য অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিয়মে এতকাল নিয়ন্ত্রিত

হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও নিয়ন্ত্রিত হইবে। জোর করিয়া কাঁঠাল পাকাইবার চেষ্টা করা বৃথা।

অর্থ-সম্প্রসারণ নীতি ইচ্ছামত প্রয়োগ করিয়া অভিপ্রেত ফল পাইবার পথে যে যে অন্তরায় বা বিঘ্ন আছে, তৎসম্বন্ধে এখানে আরও বিশদভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, আমরা কোন দেশের বিক্রয় বা হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের মোট সংখ্যা নিরূপণ করিব কিরূপে? এখানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পণ্য বলিতে মানুষের যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও শ্রমকে অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে হয়, তাহাকেও বুঝিতে হইবে। মানুষের ভোগের জন্য যে-সব কৃষি বা শিল্পজাত পণ্য তৈরি হইয়া প্রত্যহ বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করা হয়ত তেমন কঠিন নহে। কোন দেশে কত লোক ব্যবসায়ে বা চাকুরিতে নিজেদের জ্ঞান ও শ্রম বিক্রয় করিতেছে, তাহার সংখ্যা নির্দেশ করাও হয় ত দুঃসাধ্য নহে। কারণ আধুনিক কালে প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশের কর্তৃপক্ষই এই সব তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, জমি বা কারখানা হইতে নিত্য নূতন যে সব পণ্যসম্ভার বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে, উহাই একমাত্র বিক্রয়যোগ্য পণ্য নহে। বহু জিনিষ একাধিকবার হস্তান্তরিত হইতেছে। যেমন নূতন জিনিষ বিক্রয়ের জন্য আসিতেছে, তেমনি তাহার সাথে সাথে অসংখ্য পুরাতন দ্রব্যও হাত বদলাইতেছে। তারপর, ভূমি হইতে উৎপন্ন বা কারখানায় প্রস্তুত জিনিষই যে শুধু বিক্রয় হইতেছে, তাহাও ত নহে। যে ভূমি বা কারখানা হইতে পণ্য-সম্পদ আসে, সেই ভূমি ও কারখানা পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইতেছে, কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ারের বেচাকেনা অবিরত চলিতেছে। টাকার সংখ্যাতত্ত্ব বিচারে এই সব পুরাতন জিনিষ (secondhand goods) ও মূলধনের হস্তান্তর ধর্ত্তব্য নহে।

এই সব বেচাকেনাকে হিসাবের বহির্ভূত রাখিয়া বিক্রয়যোগ্য পণ্য ও শ্রমের সংখ্যা নিরূপণ করা যাইবে কি উপায়ে?

এখানেই সমস্যার শেষ নহে। টাকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিয়া জিনিষের মূল্যকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে হইলে দেশের মোট টাকার পরিমাণও ত জানা আবশ্যক। তাহাই বা জানা যাইবে কি প্রকারে?

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ক্রেডিট্ বাজারে ক্রয়শক্তি সৃষ্টি করিয়া অর্থের কাজ করে বলিয়া ইহাকে বর্ত্তমান কালে অর্থের সামিল গণ্য করা হয়। এক্ষণে সমস্যা এই, এই নিরাকার পদার্থটির পরিমাপ করা যাইবে কি উপায়ে? আর্থিক ও ব্যবসায়-জগতের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দেশের ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের নিকট গচ্ছিত টাকার অনুপাতে গ্রাহকগণকে কি পরিমাণ টাকা ধার দিবে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই একটি করিয়া সরকারী বা আধা-সরকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। সেই ব্যাঙ্কের সহিত যোগ রাখিয়া দেশের অন্যান্য প্রধান যৌথব্যাঙ্কগুলিকে কাজ করিতে হয়। দেশের স্বর্ণ বা রৌপ্য-তহবিল এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই সঞ্চিত থাকে। এই তহবিলের অবস্থার দিকে নজর রাখিয়া ঋণদানের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যান্য যৌথব্যাঙ্কগুলির স্বর্ণ-তহবিলের একটা বড় অংশও ঐ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেই জমা থাকে। অবশিষ্ট মুদ্রা ও নোট গ্রাহকগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য সাধারণ ব্যাঙ্ক-গুলি নিজের কাছে রাখিয়া থাকে। আধুনিক ব্যাঙ্ক সকল কোন্ নীতি অনুসরণ করিয়া ঋণদানের পরিমাণ নিজেদের ইচ্ছামত বাড়াইয়া ও কমাইয়া থাকে, তাহার বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখানে আমাদের শুধু ইহাই জানিয়া রাখিলে চলিবে যে, ব্যাঙ্ক কাহাকে কোন্ প্রয়োজনে কত টাকা ধার দিয়া নূতন ক্রয়শক্তি সৃষ্টি

করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা হইলে মোটের উপর অবস্থা এই দাঁড়াইতেছে যে, বিক্রয়যোগ্য জিনিষ ও শ্রমের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যেমন সুকঠিন, তাহা ক্রয় করিবার যোগ্য অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করাও সেইরূপই সুকঠিন।

দুরূহতার এখানেই পরিসমাপ্তি নহে। তর্কস্থলে ইহা যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, কোন দেশের মোট টাকার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব নহে, তাহা হইলেও আমাদিগকে আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। একটি টাকা এক দিনে একটিমাত্র বেচাকেনার কাজ করিয়াই যেমন ক্ষান্ত হইতে পারে, আবার তেমনি সেই টাকাই একদিনে দশহাত ঘুরিয়া দশটি কাজ সম্পন্ন করিতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে একটি টাকা দশটি টাকার কাজ করিতেছে; আবার দশটি টাকা দশদিনেও কোন কাজ না করিয়াই প্রভুর পকেটের মার্য্যাদা বর্দ্ধন করিতেছে। সুতরাং দেশের মোট টাকার সমষ্টি জানিতে পারিলেই শুধু চলিবে না; সেই টাকা কি পরিমাণ বেগে বেচাকেনার হাটে ছুটিয়া চলিয়াছে (যাহাকে ইংরাজীতে velocity of circulation বলে) তাহাও আমাদিগকে জানিতে হইবে। কিন্তু ইহাও মোটেই সহজ সাধ্য ব্যাপার নহে।

তবে কি কোন দেশের টাকার পরিমাণ বা উহা কিরূপ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার কোনই উপায় নাই? টাকার সংখ্যা ও গতিবেগ নিরূপণ করা কঠিন হইলেও তাহার একটা মোটামুটি ধারণা করা একেবারে অসম্ভব নহে। আজকাল লেন-দেন প্রধানতঃ ব্যাঙ্কের মারফতে চেক্‌দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে সব সাধারণ বেচাকেনার কাজ আমরা মুদ্রা বা নোট সাহায্যে প্রত্যহ সম্পন্ন করি, সেই টাকাও চেকের সাহায্যে ব্যাঙ্ক হইতেই তুলিয়া আনা হয়। অতি সামান্য টাকাই আজকাল ব্যবসায়ী বা গৃহস্থ নিজের কাছে রাখে।

সেইজন্য কি পরিমাণ টাকার প্রত্যহ আদান প্রদান চলিয়াছে, ব্যাঙ্কের হিসাব দৃষ্টে তাহা অনুমান করা অনেকটা সহজ। অবশ্য ইহাতেও একটু অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ, ব্যাঙ্কগুলি যে হিসাব রাখে, তাহাতে একই ব্যাঙ্কের বিভিন্ন আমানতকারীর মধ্যে টাকার যে আদান-প্রদান হয়, তাহার পৃথক্ হিসাব দেখান হয় না। রাম ও শ্যামের টাকা যদি এক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে এবং রাম যদি শ্যামকে কোন টাকা ঐ ব্যাঙ্কের চেক্ দ্বারা প্রদান করে, আর শ্যাম সেই চেক্ তাহার ব্যাঙ্কে জমা দেয় তাহা হইলে সেই চেকের টাকা রাম ও শ্যামের হিসাবে শুধু জমা খরচ হয়—ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া ইহার পৃথক্ হিসাব রাখার প্রয়োজন হয় না। সেই কারণে একই ব্যাঙ্ক মারফতে যত টাকার আদান-প্রদান হয়, তাহা জানিবার বা ধরিবার উপায় থাকে না। অথচ কার্য্যতঃ এইরূপ ক্ষেত্রেও জিনিষের বা শ্রমের মূল্য দেওয়া ঠিক মতই অর্থদ্বারা সম্পন্ন হইতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের সাহায্যে যে অর্থের লেন-দেন হয়, তাহার সমস্তই মানুষের ভোগের জন্য প্রস্তুত পণ্যসম্ভারের মূল্য কিংবা মানুষের শ্রমের মজুরি নাও হইতে পারে; ষ্টক্, শেয়ার, জমিজমা ক্রয়বিক্রয়ের জন্যও ব্যাঙ্কের টাকা সমভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থশাস্ত্রের যে তত্ত্ব আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য, তাহা হইতেছে টাকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কি প্রকারে মানুষের ভোগের জন্য সৃষ্ট পণ্য-সম্ভারের মূল্য ও মানুষের শ্রমের মজুরি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া যায়। সুতরাং এই বিচারের মধ্যে ষ্টক্, শেয়ার, জমিজমার হস্তান্তর বা তাহার মূল্য আসিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। এই সব মূলধন হস্তান্তরের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের যে পরিমাণ টাকা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাকে আমাদের হিসাবের বাহিরে রাখিতে হইবে। কিন্তু উহা জানা যাইবে কি উপায়ে? কারণ, কত টাকা

কার হিসাবে জমা বা খরচ হইতেছে, তাহারই হিসাব ব্যাঙ্ক রাখিয়া থাকে ; কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে উহার ব্যবহার হইতেছে তাহার হিসাব রাখা ত ব্যাঙ্কের কাজ নয়। তবে যে সব দেশে ব্যাঙ্ক-প্রথা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে (যেমন ইংলণ্ডে), সেই সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বড় বড় ব্যাঙ্ক ষ্টক্, শেয়ার ইত্যাদি মূলধন জাতীয় লেনদেনের কাজকর্ম্মই সাধারণতঃ বেশীর ভাগ করিয়া থাকে। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলিতে যে লেন দেন হয়, তাহার অধিকাংশই পণ্যের মূল্য বা শ্রমের মজুরি দিবার জন্য। এই ভাবে একটা মোটামুটি হিসাব করা যাইতে পারে।

মোটামুটি ধারণা করিবার আরও একটি উপায় আছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থার উপরও টাকার গতিশীলতা অনেকটা নির্ভর করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা যখন উর্দ্ধগামী, তখন সকল শ্রেণীর মানুষকেই অধিকতর উদার হইতে দেখা যায়। নানাবিধ পণ্য প্রস্তুত করিয়া দেশের সম্পদ গড়িয়া তুলিবার ভার যাহারা লইয়াছে, তাহারা যখন অপেক্ষাকৃত নির্ভয়ে অর্থব্যয় করিয়া নিজেদের ব্যবসায় ও কারবার সম্প্রসারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাদের নিয়োজিত শিল্পী ও শ্রমিক সকলেই সেই অর্থের ফলভাগী হইবার সুযোগ লাভ করে এবং মানুষের ব্যয়-বিমুখতা অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি অধোগামী হইলেই একটা ভীতি ও নিরাশার সঞ্চার হয় এবং সেই সন্ত্রাসের ফলে চারিদিকে এইরূপ ব্যয়সঙ্কোচ আরম্ভ হয় যে, তখন অর্থের ব্যবহার অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যে অর্থ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ হাত ঘুরিয়া পঞ্চাশটি কার্য্য সম্পন্ন করিতেছিল, তাহা হয়ত একই ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার ফল ব্যবসায়-বাণিজ্যের

পক্ষে আরও ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়—বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী দুঃসময়ে হইয়াছেও তাই।

অধিক নোট বা ক্রেডিট সৃষ্টি দ্বারা অর্থের পরিমাণ হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দিলেও টাকার গতিবেগ অতিশয় বাড়িয়া যাইবে। অর্থের সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনার প্রারম্ভেই অর্থের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত জিনিষের মূল্য কি প্রকারে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ অর্থের মূল্য কি প্রকারে হ্রাস পায় তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি। সেই কারণে যদি কোন দেশের কর্ত্তৃপক্ষ অকস্মাৎ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেন, তাহা হইলে যেখানে দু'টাকায় এক মণ চাল পাওয়া যাইতেছিল, সেখানে এক মণ চালের জন্য তিন টাকা বা ততোধিক টাকার প্রয়োজন হইবে। যখন এই ভাবে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার লক্ষণ দেখা যায়, তখন স্বভাবতঃ মানুষের ইহাই আকাঙ্ক্ষা হয় যে, মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বেই পণ্যদ্রব্য যথাসম্ভব কিনিয়া রাখা। যতই বিলম্ব করা যাইবে, ততই জিনিষের মূল্য চড়িবে ও সঞ্চিত অর্থের মূল্য হ্রাস পাইবে, এই স্বাভাবিক আশঙ্কা মানুষকে তাড়াতাড়ি অর্থব্যয়ে প্ররোচিত করে। এইরূপ সময়েই অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গতিবেগ লাভ করে। ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থা হয় যখন অর্থের পরিমাণ কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া ফেলেন। অর্থের পরিমাণ কমিলেই তাহার ক্রয়শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ও জিনিষের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এই ধারণা কাজ করিতে সুরু করিবে যে, যতই অর্থ ধরিয়া রাখা যাইবে, ততই ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং স্বল্প মূল্যে অধিক পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিবার সুযোগ লাভ করা যাইবে। এইরূপ অবস্থায় অর্থের গতিবেগ স্বভাবতঃই অত্যন্ত হ্রাস পায়। উপরোক্ত অবস্থা হইতে আমরা তাহা হইলে ইহা মানিয়া লইতে পারি যে, জিনিষের

মূল্য একবার বাড়িতে সুরু করিলেই আরও বাড়িবার আশঙ্কায় মানুষ পণ্য সংগ্রহ করিবার আগ্রহে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিবে এবং টাকার গতিশীলতা বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে জিনিষের মূল্য কমিতে থাকিলে আরও কমিবার আশায় মানুষ অর্থ ব্যয় করিতে যথাসম্ভব বিরত হইবে এবং অর্থের গতিশীলতা হ্রাস পাইবে। এই জন্যই কোন কারণে ব্যবসায় বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা একবার খারাপ হইয়া জিনিষের মূল্য হ্রাস পাইতে সুরু করিলে সেই অবস্থা ক্রমশঃই অধিকতর মন্দের দিকে যাইতে থাকে। ১৯২৯ সালের পর পৃথিবীব্যাপী যে ব্যবসায়-মন্দা সুরু হইয়াছে এবং যাহা কিছুতেই ঘুচিতে চাহিতেছে না, তাহার মূলেও আংশিক ভাবে এই নীতি কাজ করিতেছে।

এই জন্যই নব্যপন্থীরা মনে করেন যে, অতিরিক্ত নোট ও ক্রেডিট সৃষ্টি দ্বারা অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া জিনিষের মূল্য ও মানুষের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা অত্যন্ত আবশ্যক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় স্বর্ণমান পরিত্যাগ ও অত্যধিক নোট প্রচলন করার ফলে জিনিষের মূল্য শুধু বৃদ্ধি পায় নাই, ব্যবসায়-বাণিজ্যও অসম্ভব প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানে অতিরিক্ত নোটগুলি বাতিল করিয়া দিয়া সর্ব্ব দেশে সনাতন নিয়মে পুনঃ স্বর্ণমান প্রচলন করায় বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতা হইতে বিশ্বব্যাপী এই ব্যবসায়-মন্দা ও দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে।

এই সম্পর্কে ধীরপন্থীরা যে সব অন্তরায়ের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সত্য থাকিলেও একথা বলা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের হিসাব দৃষ্টে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা হইতে বিক্রয়যোগ্য জিনিষের সংখ্যা, অর্থের পরিমাণ ও তাহার গতিবেগ মোটামুটি অনুমান করিয়া লইয়া অর্থ-সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করা একান্ত অসম্ভব নহে। অতিরিক্ত অর্থই অবশ্য অতিরিক্ত সম্পদ নহে;

কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ হইতে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব, যদি ধীর স্থির ভাবে অতি সাবধানতার সহিত এই অর্থ-সম্প্রসারণ নীতি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু তাহা না করিয়া অধিকতর মূল্য হ্রাস নিবারণ করিবার জন্য সৃষ্ট সম্পদকে মানুষ আজ নিজ হাতে ধ্বংস করিতেছে। বাংলায় পাটচাষ নিরোধ, আমেরিকায় গম ও তুলা স্বেচ্ছায় অগ্নিসংযোগে ধ্বংস ও সর্ব্বক্ষেত্রে পণ্যোৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ ইহার প্রমাণ। অর্থ না বাড়াইয়া পণ্য কমান, ইহাও সংখ্যাতত্ত্বেরই প্রয়োগ—ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-প্রণোদিত আত্মঘাতী প্রয়োগ। যে সময়ে পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ "অন্নাভাবে ক্ষীণ, বস্ত্রাভাবে শীর্ণ, দিন দিন আয়ুক্ষীণ" অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, সেই সময়ে অধিক মূল্যের আশায় পণ্য সম্পদ নিরোধ ও স্বহস্তে তাহা বিনাশ করাকে আত্মঘাতী নীতি ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? দুর্গত মানবগোষ্ঠীর কিঞ্চিৎ দুঃখ লাঘবের জন্য তাহা দান করিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই; কারণ তাহা হইলে জিনিষের মূল্য আরো হ্রাস পাইবে।

আমাদের মনোজগতে ছায়া আজ কায়ার স্থান অধিকার করিয়াছে, অর্থ আজ সম্পদকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অর্থরূপ দালালটিকে আমরা যতদিন পর্য্যন্ত বাদ দিয়া চলিতে না পারিতেছি, যতদিন পর্য্যন্ত আধুনিক যুগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পণ্যের বিনিময়ে পণ্য আদান-প্রদানের রীতি (barter) প্রবর্ত্তন করিতে না পারিতেছি, ততদিন মুখের গ্রাস ধ্বংস করিয়া পণ্য-মূল্য স্থির রাখা অপেক্ষা অর্থ সৃষ্টি করিয়া মূল্য স্থির রাখা কি অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ নয়? কিন্তু উহা ত' শুধু কোন দেশবিশেষের পক্ষে সম্ভব নহে; তজ্জন্য চাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্মিলিত সহযোগিতা ও পরামর্শ। অন্যথা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হইলে এক দেশে পণ্যের মূল্য চড়িবে, অন্য দেশে পণ্যের মূল্য কমিবে এবং অনর্থ আরো বাড়িয়াই যাইবে। কিন্তু অপ্রিয় হইলেও

এই সত্যকে আজ আমাদের অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মানুষ আজ নিজেকে বড় মনে করিলেও মনে বড় হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া পৃথিবীব্যাপী যে বিশাল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ বিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতার চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে বসিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতি আজ ঘোরতর জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি নিজেদের পণ্য বিদেশে চালান করিবেন, কিন্তু অন্য দেশের পণ্য নিজেদের দেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না—ইহাই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-নীতির "নগ্ন রূপ"। এইরূপ জিনিসকেই বোধ হয় নৈয়ায়িকেরা "সোনার পিতলের কলসী" আখ্যা দিয়া থাকিবেন। কতকগুলি দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতির উপর জোর করিয়া এই নীতি পরিচালনা করা সম্ভব হইলেও স্বাধীন ও শক্তিমান জাতিদের মধ্যে এই নীতি চলিবে কি করিয়া? তাই ইহা বলা সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হইবে না যে, পৃথিবীর আজ বড় সমস্যা তথাকথিত উচ্চ জাতিসমূহের নীচ মনোবৃত্তির সমস্যা।

আধুনিক ব্যাঙ্কিং

আর্থিক জগতে ব্যাঙ্কের একাধিপত্য

বর্ত্তমান যুগে আর্থিক জগতের ভারকেন্দ্র প্রত্যেক দেশের বিশাল ব্যাঙ্কগুলিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে কার্নেগি, রথ্‌স্চাইল্ড, রক্‌ফেলার, ফোর্ড বা নিজাম যতই ধনী হউন না কেন, বর্ত্তমান দুনিয়ার প্রকৃত অধিপতি এই ব্যাঙ্কগুলিই। কারণ বিশাল সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজের সম্পদও ইহাদের নিকট আজ তুচ্ছ। পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া ইহারাই দুনিয়াটাকে আজ মুঠার মধ্যে রাখিয়া পরিচালনা করিতেছে।

অর্থ পদার্থটিকে আমরা সকলেই ভালরূপে চিনি ও জানি। কিন্তু ইহা কোথা হইতে কি ভাবে আসে এবং কোথা দিয়া কি ভাবে সরিয়া পড়ে, তাহা আমাদের অনেকেরই বুদ্ধির অগম্য। আমাদের অতিযত্নে সঞ্চিত অর্থপুঁটুলি ভাটার টানে অকস্মাৎ আমাদের হাতছাড়া হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার কোথা হইতে জোয়ার আসিয়া আমাদের শূন্য তহবিলকে ভরিয়া দেয়। বিনাকারণে এক দিন আমাদের যে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও জমিজমার মূল্য কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল, তাহাই আবার এক দিন ফাঁপিয়া উঠিয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। আশা ও নিরাশার মধ্য দিয়া আমরা ইহার ফলমাত্রই শুধু ভোগ করি; কিন্তু কারণ কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। অর্থের এই রহস্যময় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি আমরা জানিতে চাই, বর্ত্তমান জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জ্জাতিক কাজ-কারবারের জটিল ও কুটিল পথে যদি প্রবেশলাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমে আধুনিক ব্যাঙ্কের স্বরূপ ভাল করিয়া

জানিতে ও বুঝিতে হইবে। রহস্তময় আর্থিক জগতের দ্বারোদ্‌ঘাটনের ইহাই সহজ পন্থা।

ব্যাঙ্কের বর্ত্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি এক দিনে হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী সর্ব্ব বিষয়ে যেমন শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়াছে, প্রয়োজনের তাগিদে বাঙ্কগুলিও তেমনই ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহাদের শৈশব অবস্থার কথা প্রথমতঃ আলোচনা করা যাক্। আমাদের কাজ-কারবার যখন প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত এবং আর্থিক জগতে ইংলণ্ডের আধিপত্যই যখন প্রবল, তখন সেই দেশের ইতিহাস আলোচনা করাই বিধেয়।

ব্যাঙ্কের উৎপত্তি ও নোটের সৃষ্টি

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের স্বর্ণকারগণ প্রথমতঃ নিজেদের মূল্যবান গহনাপত্র ও হীরা-জহরতের সহিত অপরের ধনসম্পদও গচ্ছিত রাখিতে সুরু করে। দস্যুতস্করের হাত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য ইহাদিগকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইত। সেই জন্যই জনসাধারণও তাহাদের ধনরত্ন নিরাপদে রাখিবার জন্য এই সব স্বর্ণকারের আশ্রয় গ্রহণ করিত। আমাদের দেশে অনেক স্থানে এইরূপ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ধনী জমিদার, মহাজন, সাহুকারের নিকটে আজ পর্য্যন্ত অনেকে নিজেদের ধনরত্ন গচ্ছিত রাখিয়া থাকে। ইংরেজ স্বর্ণকার দেখিতে পাইল যে, প্রয়োজনের সময়ে অনেকেই তাহার নিকট টাকা ধার করিতে আসে; অথচ যাহারা অর্থ বা স্বর্ণ-রৌপ্য গচ্ছিত রাখে, নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহারা উহা ফেরত চাহে না। এইরূপ সুযোগ দেখিয়া স্বর্ণকারগণ তাহাদের নিকট গচ্ছিত অর্থ অপরকে সুদ লইয়া ধার দিতে আরম্ভ করে। যাহারা টাকা

আমানত রাখিত, প্রথম অবস্থায় তাহারা কোনরূপ সুদ পাইত না। ক্রমে এই সব আমানতী টাকার জন্য অল্প হারে সুদ দেওয়া আরম্ভ হয়। ইহাই ব্যাঙ্কের প্রথম সূত্রপাত। সময়ে ইহাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়িলে, ইহারা নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারে প্রমিসরি নোট (I promise to pay on demand) প্রচলন করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের প্রচলিত প্রমিসরি নোটে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকলেই উহা গ্রহণ করিতে থাকে এবং এই সব নোট সাধারণের হাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য-মুদ্রার ন্যায় চলিতে সুরু করে। প্রয়োজনমত নোটের বিনিময়ে নগদ মুদ্রা পাইতে কোনরূপ বাধা না-হওয়ায় এইরূপ নোটের প্রচলন সহজেই বিস্তার লাভ করে এবং এই ভাবেই ব্যাঙ্ক ও নোটের সৃষ্টি হয়। পরের ধনরত্ন গচ্ছিত রাখা, উহা পুনরায় অপরকে সুদে ধার দেওয়া, নগদ টাকার বিনিময়ে নোট প্রচলন—ইহাই তখনকার স্বর্ণকার-ব্যাঙ্কারদের প্রধান কাজ ছিল। আমরা নিম্নে উহাদের হিসাবের একটি নমুনা দিতেছি—

ব্যাঙ্কের দেনা :		ব্যাঙ্কের সংস্থান :	
'ক'-এর নিকট আমানত বাবদ	—১,০০০৲	নগদ তহবিল (স্বর্ণ ও মুদ্রা)	১,০০০৲
সর্ব্বসাধারণের নিকট নোট বাবদ	—৯,০০০৲	'ক,' 'খ,' 'গ,' 'ঘ,' এর নিকট দাদন	—৯,০০০৲
	১০,০০০৲		১০.০০০৲

স্বর্ণকার যখন দেখিতে পাইল, তাহার প্রচলিত নোটগুলি অবলীলাক্রমে দশের মধ্যে চলিয়াছে এবং উহার বিনিময়ে নগদ অর্থ বেশী লোকে চাহিতেছে না, তখন তাহার সাহস ক্রমেই বাড়িয়া যায় এবং পূর্ব্বে

যেখানে সে নগদ ১০০০৲ টাকা হাতে রাখিয়া ৯,০০০৲ টাকার নোট প্রচলন করিতে সাহসী হইয়াছিল, সেখানে সে দুঃসাহস করিয়া আরও অধিক টাকার নোট ধার দিতে আরম্ভ করে। যৎসামান্য ব্যয়ে নোট ছাপাইয়া তাহা সুদে খাটাইয়া লাভবান হইবার লোভ ইহাদিগকে এমনই পাইয়া বসিল যে, সামান্য নগদ অর্থ পুঁজি লইয়া ইহারা অত্যন্ত অধিক পরিমাণ নোট সৃষ্টি করিতে সুরু করিল। সকলে সমস্ত নোট এককালীন উপস্থিত না করিলেও যে পরিমাণ নোট উপস্থিত হইতে লাগিল তাহার টাকাও ইহারা দিতে পারিল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইহাদের অনেককে দরজা বন্ধ করিতে হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমানতকারিগণের গচ্ছিত অর্থও বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই অবস্থা দেখিয়া ১৮৪৪ সালে নূতন আইন করিয়া, কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্ক ব্যতীত আর সকল ব্যাঙ্কের হাত হইতে নোট প্রচলনের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশে আইন দ্বারা নোট প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং কয়েকটি দেশ ভিন্ন (ইহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান) আর সব দেশেই ব্যবসাদারী যৌথ ব্যাঙ্কের হাত হইতে নোট প্রচলনের অধিকার অপসারিত করা হইয়াছে।

চেকের সৃষ্টি

নোট সৃষ্টির ক্ষমতা এই সব ব্যাঙ্কের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল বটে, কিন্তু শীঘ্রই নোটের পরিবর্ত্তে ইহারা অর্থোপার্জ্জনের আর একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল এবং গচ্ছিত টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক আমানতকারীকে একখানা করিয়া পাস-বই ও চেক-বই দিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক চেক-বইয়ে ২৫।৫০।১০০ কিংবা ততোধিক

চেক থাকে। আমানতকারী তাহার প্রয়োজনমত বই হইতে এক একখানা চেক লইয়া তাহা যথাযথ পূরণ করিয়া পাওনাদারকে দিয়া থাকে। যাহাকে টাকা দিতে হইবে তাহার নাম ও যত টাকা দিতে হইবে তাহার সংখ্যা পূরণ করিয়া আমানতকারীকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হয়। তাহার স্বাক্ষরের নমুনা পূর্ব্বাহ্নেই ব্যাঙ্কে রাখা হইয়া থাকে। যাঁহার নামে চেক দেওয়া হয়, তিনি এই চেক ব্যাঙ্কে দিয়া নগদ টাকা লইতে পারেন, কিংবা নিজ নামে ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা করিয়া দিতে পারেন। মাসে একবার পাস-বইখানা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিলেই কত টাকা খরচ হইল এবং কত টাকা উদ্বৃত্ত (balance) রহিল তাহা হিসাবে তুলিয়া দেওয়া হয়। আজকাল পাস-বইও পাঠাইতে হয় না—ব্যাঙ্ক হইতেই প্রতিমাসে হিসাব ডাকযোগে পাওয়া যায়। চেক-দাতা ও চেক-গ্রহীতা উভয়ের হিসাব যদি একই ব্যাঙ্কে থাকে, তাহা হইলে টাকাটা একজনের হিসাবে খরচ ও অপরের হিসাবে শুধু জমা করিয়া লইলেই চলে; ব্যাঙ্ককে নগদ কোন টাকা দিতে হয় না এবং সেই জন্য ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলের কোন নড়চড়ও হয় না। কিন্তু যদি চেক-গ্রহীতার হিসাব অন্য ব্যাঙ্কে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্ক চেক-দাতার ব্যাঙ্ক হইতে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া নিজ গ্রাহকের হিসাবে জমা করিয়া লয়। চেকের টাকা নগদ না তুলিয়া কিংবা নিজের হিসাবে জমা না দিয়া চেকের পৃষ্ঠে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া তৃতীয় কোন ব্যক্তিকেও চেক-গ্রহীতা তাহার দেনা মিটাইবার জন্য দিতে পারেন এবং এই ভাবে একই চেক বিভিন্ন হাত ঘুরিয়া সর্ব্বশেষ ব্যক্তির ব্যাঙ্ক-হিসাবে জমা হইতে পারে। রাম শ্যামের নামে যে-চেক দিবেন, শ্যাম তাহা ভাঙাইয়া নগদ টাকা না লইয়া কিংবা নিজ ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা না দিয়া, নিজের দেনার জন্য

উহা যদুকে দিতে পারেন, যদু আবার উহা হরিকে দিতে পারেন—এ ভাবে বহু হাত ঘুরিয়া গৌরের নিকট পৌঁছিলে, তিনি উহা নিজ ব্যাঙ্ক-হিসাবে জমা করিয়া লইতে পারেন।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন চেকের দরুণ নগদ টাকার আদান-প্রদান না হইয়া পরস্পরের দেনাপাওনা মিটিয়া গিয়া যে ব্যাঙ্কের দেনা দাঁড়ায় তাহাকে অতিরিক্ত টাকাটা শুধু নগদ দিলেই চলে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যাক্। 'ক' নামক ব্যাঙ্কের নিকট যদি 'খ' নামক ব্যাঙ্কের পাঁচখানা চেকের দরুণ মোট পাঁচ হাজার টাকা পাওনা হয়; পক্ষান্তরে 'খ' নামক ব্যাঙ্কের নিকট যদি 'ক' নামক ব্যাঙ্কের ছ-খানা চেকের দরুণ মোট ছয় হাজার টাকা প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে 'ক' ব্যাঙ্কের নগদ ১০০০৲ টাকা মাত্র 'খ' ব্যাঙ্ককে দিলেই চলিবে—যদিও উভয় ব্যাঙ্ককে ১১,০০০৲ টাকারই জমাখরচ করিতে হইবে। 'ক' ব্যাঙ্কে উহার গ্রাহকদের নামে জমা ৬,০০০৲ টাকা ও খরচ ৫,০০০৲ টাকা এবং 'খ' ব্যাঙ্কে খরচ ৬০০০৲ টাকাও ও জমা ৫,০০০৲ টাকা পড়িবে। পরিণামে 'ক' ব্যাঙ্কের আমানত মোটের উপর ১,০০০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং 'খ' ব্যাঙ্কের আমানত ১,০০০৲ টাকা হ্রাস পাইবে। এই হাজার টাকাটাই 'খ' ব্যাঙ্কের নগদ দিতে হইবে 'ক' ব্যাঙ্ককে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চেক প্রবর্ত্তনের ফলে মোট ১১,০০০৲ টাকার দেনাপাওনার জন্য ব্যাঙ্কের নগদ মাত্র ১,০০০৲ টাকার প্রয়োজন হইতেছে।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে খুব অল্প ক্ষেত্রেই চেকের বিনিময়ে নগদ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। দৈনন্দিন হাট-বাজার করা, ট্রাম-বাসের ভাড়া দেওয়া, বায়োস্কোপ-থিয়েটারের টিকিট কেনা প্রভৃতি খুচরা ব্যয় ভিন্ন অধিকাংশ কাজকর্ম্ম চেক দ্বারাই সম্পন্ন

হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যেও নগদ টাকার লেনদেন বেশী করিতে হয় না, পরস্পরের দেনাপাওনা ওঝাবাদ গিয়া যাহার যাহা দেনা দাঁড়ায় শুধু ঐ টাকাটা নগদ দিলেই চলে।* সেই জন্যই নোট-প্রচলনের অধিকার রহিত হইয়া গেলেও নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে চেক ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়া ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। নোটের প্রচলন থাকা কালে ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার হিসাবের একটি নমুনা আমরা দিয়াছি। চেক প্রবর্ত্তিত হইবার পর উহাদের হিসাব কি ভাবে রাখা হইত তাহার একটি নমুনা আমরা দিতেছি—

ব্যাঙ্কের দেনা :		ব্যাঙ্কের সংস্থান :	
আমানত বাবদ	—১০,০০০৲	নগদ তহবিল (স্বর্ণ ও মুদ্রা)	১,০০০৲
		‘ক’, ‘খ’, ‘গ’ ‘ঘ’-এর নিকট দাদন	—৯,০০০৲
	১০,০০০৲		১০,০০০৲

পূর্ব্ব হিসাব ও এই হিসাবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বে যেখানে নোটের দরুণ ব্যাঙ্কের ৯০০০৲ টাকার দায়িত্ব ছিল, এখন সেখানে আমানতের জন্য তাহাকে ৯০০০৲ টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাহার দেনা বা দায়িত্ব সমানই রহিয়াছে, শুধু যে-দেনা ছিল নোটের অধিকারীর নিকট, সেই দেনা দাঁড়াইয়াছে এখন আমানতকারীর নিকট।

এখানে কাহারও মনে একটু খটকা বাধিতে পারে। কেহ হয়ত

---

* বড় বড় নগরে এই কাজ করিবার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে; ইহাকে ক্লিয়ারিং হাউস বলা হয়। সেখানে প্রত্যহ সকল ব্যাঙ্কের চেক জড়ো হয় এবং প্রত্যেকের দেনাপাওনা ওঝাবাদ অন্তে সাব্যস্ত হয়। কলিকাতায় ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক এই কাজ করিত। এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া করে।

ভাবিতে পারেন, পূর্ব্বে ১০০০৲ টাকার আমানত সম্বল করিয়া ৯,০০০৲। ১০,০০০৲ টাকা দাদন করিতে পারা যাইত। এক্ষণে নয় হাজার টাকা দাদন করিতে হইলে প্রথমেই পুরাপুরি নয় হাজর টাকা নগদ আমানত পাওয়া আবশ্যক। এইটি ভুল ধারণা; কারণ প্রত্যেক দাদন বা ধার (credit) একটি নূতন আমানত সৃষ্টি করে, এই নীতিটি এখানে আমাদের ভুলিলে চলিবে না। 'ক' নামক ব্যাঙ্ক যদি 'খ' নামক ব্যক্তিকে এক লক্ষ টাকা ধার দেয় তাহা হইলে ইহার অর্থ এই নহে যে 'খ' নোটে ও মুদ্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে। আধুনিক কালে ঋণ করিয়া কেহই নগদ অর্থ নিজ গৃহে লইয়া যায় না। সেই অর্থ দ্বারা ব্যাঙ্কেই আমানতী হিসাব খোলা হইয়া থাকে। এই কারণে ব্যাঙ্ক যত টাকা ঋণ দান করে প্রায় সেই টাকাই ডিপোজিট হিসাবে ফিরিয়া পায় এবং এইরূপে ঋণের টাকা ও আমানতী টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে ব্যাঙ্কের হিসাবে দেনার ঘরে যে ১০,০০০৲ টাকা আমানত দেখান হইয়াছে তন্মধ্যে এক হাজার টাকাই প্রকৃত ক্যাশ আমানত, বাকী নয় হাজার টাকা শুধু 'পেপার' আমানত; যে-টাকাটা 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ'কে ধার দেওয়া হইয়াছে (পাস-বই ও চেক-বই মূলে), তাহাই আমানতরূপে ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা পড়িয়াছে। ধারও যেমন নগদ দেওয়া হয় নাই, তেমনই আমানতের টাকাও নগদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যেমন নোটের বেলা তেমনই চেকের বেলায়ও ব্যাঙ্ক নগদ মাত্র হাজার টাকা সম্বল করিয়া স্বচ্ছন্দে নয় দশ হাজার টাকা দাদন করিতে পারিতেছে। এখানে কথা উঠিতে পারে, আমি যে টাকা ধার করিব, তাহার সমস্তটাই যে ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিব তাহার নিশ্চয়তা কি? ঠিক কথা। কিন্তু আমি যেমন আমার প্রয়োজনমত চেক দ্বারা টাকা তুলিয়া লইয়া আমার পাওনাদারকে দিব এবং তিনি উহা তাঁহার ব্যাঙ্কে জমা দিবেন,

তেমনই আবার অপরের দেওয়া অন্য ব্যাঙ্কের চেকও ত আমার ব্যাঙ্কে আসিয়া জমা হইবে। সুতরাং হরেদরে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চেকেরই আদানপ্রদান হইবে বেশী, নগদ টাকার প্রয়োজন অতি সামান্যই হইবে।

ক্যাশ তহবিল ও দাদন

অবশ্য এখানে একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। বর্ত্তমান সময়ে নগদ টাকার ব্যবহার ও প্রয়োজন হ্রাস পাইতেছে সত্য, কিন্তু একেবারে উঠিয়া যায় নাই। দশ হাজার টাকা আমানতের জন্য হয়ত এক হাজার টাকার অধিক ক্যাশ তহবিল আবশ্যক হয় না। কিন্তু বিশ হাজার টাকা আমানত স্থলে, অন্ততঃ দুই হাজার টাকার নগদ দাবী মিটাইবার প্রয়োজনও ব্যাঙ্কের হইবে না, এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। সেই জন্য নগদ তহবিলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ইচ্ছামত ধার দিয়া আমানত বৃদ্ধি করা মোটেই নিরাপদ নহে। তাহা করিতে গেলে, নগদ তহবিলের অনুপাতে অত্যধিক নোট সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙ্কগুলি যেমন এক কালে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, এ-ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা হইবে। তাই, কি পরিমাণ নগদ তহবিল রাখিয়া কত টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে, সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাঙ্কগুলি তাহার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছে। বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ গচ্ছিত অর্থের এক-দশমাংশ নগদ তহবিলে রাখিয়া নয়-দশমাংশ ধার দিয়া থাকে। অর্থাৎ আমানত যদি দশ হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে নগদ এক হাজার টাকা হাতে রাখিয়া নয় হাজার টাকা দাদন দিতে ও নূতন আমানত সৃষ্টি করিতে পারে।

সাধারণ অবস্থায় আমানতের এক-দশমাংশের অধিক টাকা তুলিয়া লওয়া হয় না, বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাদের এই জ্ঞান লাভ হইয়াছে। কিন্তু কোন কারণে ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারিগণের

আস্থা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। সেই জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া, প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ককে তাড়াতাড়ি নগদ তহবিল বাড়াইতে হয় এবং তজ্জন্য নূতন ধার দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে কিংবা পুরাতন ধারের টাকা অবিলম্বে আদায় করিয়া লইতে হয়। ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ টাকা ধার দিবে তাহা শুধু তাহার নগদ তহবিলের উপরই নির্ভর করে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন এবং যাহারা টাকা ধার করিবে তাহাদের অবস্থা ও যোগ্যতা—এই সবের উপর নির্ভর করে।

কেন্দ্রীয় বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছার উপর। অধুনা প্রত্যেক দেশে একটি করিয়া সরকারী বা আধা-সরকারী 'সেণ্ট্রাল' ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিরাট সরকারী তহবিল ইহাতেই রাখা হয় এবং ইহা হইতেই খরচ করা হয়। গবর্ন্মেণ্টের যখন ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহার ব্যবস্থাও ইহারাই করিয়া থাকে। ইহারাই দেশের মুদ্রা ও নোট সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং দেশের স্বর্ণ-তহবিলও ইহাদের নিকটই সঞ্চিত ও গচ্ছিত থাকে। এই ব্যাঙ্ক গবর্ন্মেণ্টের সহযোগিতায় পরিচালিত হইলেও যৌথ কারবারের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং গবর্ন্মেণ্টের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন নহে। রাজনৈতিক দলাদলি, ঝড়-ঝাপটার বাহিরে থাকিয়া দেশের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলাই ইহাদের মুখ্য কর্ম্ম ও মূল নীতি। বিলাতের এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম "ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড"। আমাদের দেশে এই প্রকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব ছিল। দেশবাসীর বহুদিনের আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি "রিজার্ভ

ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া” নামে এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পণ্যমূল্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের আর্থিক অবস্থা, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়ান-কমান নীতি এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, অর্থ বলিতে মুদ্রা বা নোটই শুধু বুঝায় না; ধার বা 'ক্রেডিট' মূলে যে বিরাট কাজকর্ম্ম আজ দুনিয়ায় চলিয়াছে, তাহাও অর্থেরই সামিল। মুদ্রা ও নোট যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করে, তেমনি 'ক্রেডিট' সৃষ্টি করিয়া থাকে প্রধানতঃ ব্যবসাদারী যৌথ ব্যাঙ্কগুলি। এই ক্রেডিট বা দাদনের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাক্ষাৎ সম্পর্ক তেমন না থাকিলেও, গৌণ প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করে যে, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি অতিরিক্ত ক্রেডিট বা দাদন দ্বারা নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে এবং নিজেদেরও বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এক ধার হইতে কোম্পানীর কাগজ, ট্রেজারি বিল ও অন্যান্য সিকিউরিটি বাজারে বিক্রয় করিতে সুরু করিবে এবং তখন এই সব সিকিউরিটি ক্রয় করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে আরম্ভ করিবে। বিপদ দেখিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির তখন দাদন কমান ভিন্ন উপায়ান্তর থাকিবে না। ফলে ক্রেডিট মূলে বাজারে যে অতিরিক্ত অর্থের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা প্রতিহত হইবে। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট দ্বারা যথোচিত অর্থ সৃষ্টি করিতে না পারায় পণ্যমূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে, তাহা

হইলে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড অমনই কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও অন্যান্য সিকিউরিটি খরিদ করিতে আরম্ভ করিবে। ইহার ফলে বাজারে নূতন অর্থের আমদানী হইয়া উহা যৌথ ব্যাঙ্কগুলির আমানত হিসাবে স্থান লাভ করিবে এবং উহাদের নগদ তহবিল বৃদ্ধি করিবে। তখন দাদন দিবার পক্ষে ব্যাঙ্কগুলির আর কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। তাই বলিতেছিলাম, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট-সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র হইলেও, এই বিষয়ে ইহারা কেন্দ্রী ব্যাঙ্কের প্রভাব বা কর্ত্তৃত্ব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। মুক্ত নহে বলিয়াই দেশের প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে একটি সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

যৌথ ব্যাঙ্ক ও তাহার কর্ম্মতালিকা

প্রত্যেক ব্যবসায়েরই দুইটি দিক আছে। একটি তাহার দেনার দিক, আর একটি তাহার আয় বা সংস্থানের দিক। ইতিপূর্ব্বে আমরা ব্যাঙ্কের প্রাথমিক যুগের দেনাপাওনার একটি সহজ হিসাব দিয়াছি। এক্ষণে ষোলটি প্রধান বিলাতী ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার হিসাব দিতেছি। উহা হইতে ইহাদের সম্মিলিত অর্থবল ও দেনাপাওনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৬টি বিলাতী যৌথ ব্যাঙ্কের সমষ্টিগত হিসাব

(১৯৩২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

দেনা	পাউণ্ড	সংস্থান	পাউণ্ড
মূলধন (নগদ প্রাপ্ত)	৮০০লক্ষ	নগদ তহবিল (ব্যাঙ্ক অব্	
রিজার্ভ	৫৫০লক্ষ	ইংলণ্ডে গচ্ছিত টাকা	
অদত্ত লভ্যাংশ	৫০লক্ষ	সহ)	২,৭০লক্ষ
জামিন	৯৬০লক্ষ	শেয়ার মার্কেটে স্বল্প-	

আমানত	২০.৬৪০লক্ষ	মেয়াদী দাদন	১,৪৯০লক্ষ
		বিল বা হুণ্ডী খরিদ	৩,৮৯০লক্ষ
		কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঋণ দান	৭,৯৯০লক্ষ
		কোম্পানীর কাগজ ও সিকিউরিটি খরিদ	৫,২০০লক্ষ
		জামিনের সিকিউরিটি	৯৬০লক্ষ
		ব্যাঙ্ক-গৃহ ও অন্যান্য সম্পত্তি	৫০০লক্ষ
মোট	২৩,০০০লক্ষ	মোট	২৩,০০০লক্ষ

প্রথমতঃ দেনার দিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। অদত্ত লভ্যাংশ (unclaimed dividend) বাদ দিলে, এই সব ব্যাঙ্কের দেনা প্রধানতঃ চারি প্রকারের।

১। যে-সব অংশীদারের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক তাহার মূলধন জোগাড় করিয়াছে, তাহাদের নিকট ঐ মূলধনের নিমিত্ত ব্যাঙ্ক দায়ী।

২। ব্যাঙ্ক তাহার কারবারের লাভ হইতে যে টাকার রিজার্ভ তহবিল করিয়াছে তাহার জন্য সে দায়ী। এই দায় অবশ্য তাহার নিজের নিকটেই।

৩। তৎপর তাহার প্রধান দেনা আমানতকারিগণের নিকট। তাহার কারবারের পুঁজির বড় অংশই তাহাদের নিকট হইতে আসিয়াছে।

৪। এতদ্ব্যতীত তাহার আরও একটি দেনা আছে। ইহাকে আমরা সম্ভাব্য দেনা (contingent liability) বলিতে পারি। এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তি বা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করে এবং কোন

ব্যাঙ্ক যদি তাহার জন্য জামিন হয়, তাহা হইলে টাকা পরিশোধের দায় প্রধানতঃ দেনদারের হইলেও, তিনি পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে ব্যাঙ্ককেই ঐ টাকা পূরণ করিতে হইবে। এই ত গেল দেনার দিক। ব্যাঙ্কের সংস্থান বা পাওনার দিক সম্বন্ধে এইবার সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

১। তহবিলের একটা অংশ চলতি প্রয়োজনের জন্য ব্যাঙ্ককে সর্ব্বদা নিজের নিকটে রাখিতে হয়। আমানতকারিগণের দৈনন্দিন নগদ টাকার দাবী মিটাইবার জন্যই হাতের কাছে এই টাকাটা রাখা প্রয়োজন। ইহার একটা অংশ চাহিবামাত্র দিবার সর্ত্তে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চলতি হিসাবে বিনা সুদে গচ্ছিত থাকে; এই টাকা হইতে ব্যাঙ্কের কোনরূপ আয় হয় না।

২। শেয়ারের বাজারে (stock-exchange) শেয়ার বেচাকেনা করিয়া শেয়ারের দালালগণ বহু টাকা উপায় করে। এই কাজের জন্য যে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয় দালালগণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে কিংবা শেয়ার বন্ধক রাখিয়া উহা ব্যাঙ্ক হইতে অল্প দিনের মেয়াদে ধার করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের পক্ষে এই প্রকার দাদনের সুবিধা এই যে, প্রয়োজনমত টাকাটা সুদ সহ অল্প দিনের মধ্যে ঘুরিয়া আসে এবং পুনরায় উহা ঐরূপে ব্যবহার করা চলে।

৩। আধুনিক কালে লক্ষ লক্ষ টাকার কৃষি- ও শিল্প-দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দেশবিদেশে চালান হইয়া থাকে। ইহার মূল্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না, অথচ মূল্যের টাকাটা সত্বর পাওয়া না গেলে ব্যবসায়ীর অসুবিধা ঘটে। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্যবিক্রেতা তাহার মূল্যের বিল ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিয়া টাকাটা অগ্রিম পাইতে পারে। বিলের সত্যতা ক্রেতাকে কিংবা তাহার পক্ষে কোন নামকরা ব্যাঙ্ককে বিলের উপর স্বাক্ষর করিয়া

মানিয়া লইতে হইবে। এই টাকা সাধারণতঃ ৩ মাসের মধ্যে ক্রেতাকে শোধ করিতে হয়; ৬ মাসের অনূর্দ্ধকাল মধ্যে ইহা অবশ্য দেয়। প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য বর্ত্তমান যুগে এই ভাবে ব্যাঙ্কের মারফতে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ব্যাঙ্কগুলি এই সব বিল বা হুণ্ডী ক্রয়বিক্রয়ের কাজ করিয়া বেশ একটা মোটা টাকা লাভ করিয়া থাকে। বিল বা হুণ্ডী বহু প্রকারের আছে; তাহার বিস্তৃত আলোচনা এইখানে সম্ভব নহে।

৪। অনেক ব্যাঙ্ক, বিশেষতঃ জার্ম্মান ব্যাঙ্ক, দেশের কৃষি- ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মূলধনও জোগাইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্কের নিরাপত্তার দিক হইতে এইরূপ নূতন প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরিদ নিরাপদ নহে মনে করিয়া বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি এই জাতীয় কাজে টাকা খাটান পছন্দ করে না। তৎপরিবর্ত্তে ব্যবসাজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত কারবারকে, এমন কি ব্যক্তিবিশেষকে চলতি প্রয়োজনের জন্য অল্পদিনের মেয়াদে ইহারা ঋণদান করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার জন্য কলকারখানা ও অন্যান্য সম্পত্তি জামিন লওয়া হয়। বিলাতী ব্যাঙ্কের বিরাট আমানতী টাকার অর্দ্ধেকেরও অধিক কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য দাদন দেওয়া হইত। ব্যবসা মন্দা সুরু হওয়ার পর এইরূপ দাদনের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও মোট দাদনের প্রায় অর্দ্ধেক এই বাবদে খাটিতেছে। অতি সামান্য সুদে (বার্ষিক শতকরা ৫৲।৬৲টাকা) এরূপ বিরাট অর্থভাণ্ডারের আনুকূল্য লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই শিল্পে ও বাণিজ্যে ইংলণ্ড ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ আজ এতটা বড় হইতে পারিয়াছে।

৫। কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপ্যাল বণ্ড,* সুপ্রতিষ্ঠিত যৌথ

---

* টাকার প্রয়োজন হইলে বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটি তাহাদের আয় জামিন রাখিয়া যে দলিলমূলে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে "মিউনিসিপ্যাল বণ্ড" বলে।

কারবারের অংশ ক্রয় ব্যাঙ্কের টাকা খাটাইবার অন্যতম উপায়। টাকার বাজারে এইসব সিকিউরিটির বেশ চাহিদা আছে। প্রয়োজন হইলে অতি সহজে এইগুলি শেয়ার মার্কেটে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করা চলে। বর্ত্তমান কালে মানুষের বিষয়-সম্পত্তির একটা প্রধান অংশই এই সব Gilt-edged security।

৬। এতদ্ব্যতীত নিজেদের জন্য বড় বড় আপিস-গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যাঙ্কের টাকার একটা অংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার একাংশ নিজেদের জন্য রাখিয়া অপরাংশ অন্য ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেওয়া হয়। এই উপায়ে ভাড়া বাবদ নিজেদের জন্য বহু অর্থ ত বাঁচিয়া যায়ই অধিকন্তু অন্যের নিকট হইতে বেশ একটা স্থায়ী আয়ও হয়। কলিকাতায় লালদীঘির চতুষ্পার্শ্বস্থ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক-গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব।

এই বার বিলাতী ব্যাঙ্কগুলির আমানতের শতকরা কত টাকা কি বাবদ খাটিতেছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

	নগদ তহবিল (ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে গচ্ছিত টাকা সহ)	শেয়ার মার্কেটে অল্পদিনের মেয়াদে দাদন	বিল বা-হুণ্ডী খরিদ	কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার খরিদ	কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দাদন
১৯২৫	১১·৮	৭·০	১৩·৬	১৭·২	৫১·৪ = ১০০
১৯৩০	১০·৭	৭·৮	১৪·৭	১৪·১	৫৩·৫ = ১০০
১৯৩২ (মে পর্য্যন্ত)	১০·৬	৫·৪	১৭·৮	২৭·৩	৩৯·৯ = ১০০

আধুনিক ব্যাঙ্কিং (২)

ব্যাঙ্কের উৎপত্তি, নোট ও চেকের সৃষ্টি, আধুনিক যৌথব্যাঙ্ক সমূহের কার্য্যতালিকা, কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদের দেশের মহাজনী কারবারের ন্যায় বিলাতেও প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাঙ্কের সাধারণ লেনাদেনার কাজকর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের হাতে ছিল। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার, প্রয়োজনের দাবী ও নানারূপ জটিলতার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত অর্থ ও অনন্যসাধারণ ব্যবসাবুদ্ধির আবশ্যক হইলে অন্যান্য যৌথ কারবারের ন্যায় সাধারণের নিকট অংশ বিক্রয় করিয়া বেসরকারী যৌথব্যাঙ্ক সৃষ্টির প্রয়োজন শক্তিসম্পন্ন লোকেরা অনুভব করিলেন। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের অর্থবল যেমন বৃদ্ধি পাইল, ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে ও টাকার বাজারে ইহাদের প্রভাব প্রতিপত্তিও তেমনি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে নানা প্রকার কাজকর্ম্ম ইহাদের হাতে আসিয়া পড়িল।

আন্তর্জ্জাতির বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের স্থান

বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য এই সব ব্যাঙ্কের মারফতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুধু একই দেশের বহু লোক মধ্যে নহে, বহু দেশের অগণিত লোক মধ্যে আজ অবলীলাক্রমে যে ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, সমস্ত দুনিয়া যে আজ এত সহজে বেচা-কেনার জন্য সম্মিলিত হইতে পারিতেছে, ইহার জন্য পরস্পরকে চিনিবার বা জানিবার প্রয়োজন হইতেছে না, ইহা সম্ভব হইয়াছে বর্ত্তমান কালের

পৃথিবীব্যাপী শক্তিশালী ব্যাঙ্কগুলির জন্য। ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই জাহাজবোঝাই পণ্য দেশ হইতে দেশান্তরে চালান হইতেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন সাত সমুদ্র তের নদীর উভয় তীরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারে ও বেতারে সম্পন্ন হইতেছে। ক্রেতার পক্ষে এক ব্যাঙ্ক টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করিতেছে; বিক্রেতার পক্ষে আরেক ব্যাঙ্ক টাকা দিবার ভার লইতেছে। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে চেনাপরিচয়ের প্রয়োজন হইতেছে না। বড় বড় বন্দরে ব্যাঙ্কের গুদামেই ক্রেতার পক্ষে মাল গচ্ছিত থাকিতেছে। টাকা পাইয়া তবে তাহার ব্যাঙ্ক মাল ছাড়িয়া দিতেছে। বিশ্বস্ত ক্রেতা হইলে টাকা না লইয়াও মাল ছাড়িয়া দিতেছে।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টিকে আর একটু পরিষ্কার করিতেছি। ধরা যাক্, কোন ইংরেজ বণিক কলিকাতার কোন ব্যবসায়ীর নিকট পাঁচ লক্ষ টাকার কাপড় বা লৌহ চালান দিয়াছে। ইংরেজ বণিক লণ্ডনের বন্দরে মাল 'বুক' করিয়াই ক্রেতার নামের বিল, চালান (invoice), জাহাজের রসিদ (bill of lading) ও মালের বীমাপত্র (Insurance Policy) তাহার ব্যাঙ্কে জমা দিয়া টাকাটা পাইতে পারে। তখন পর্য্যন্ত মাল হয়ত বিলাতের জাহাজ ঘাটেই পড়িয়া আছে। বিলাতের ব্যাঙ্ক তাহার কলিকাতার শাখা, কিম্বা এজেণ্টের নিকট অথবা ক্রেতার কলিকাতা-ব্যাঙ্কের নিকট ঐ বিল এবং চালানাদি পাঠাইয়া দিবে। মাল কলিকাতায় পৌঁছিলে এখানকার ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া মাল খালাস করিয়া লইবে। খুব বিশ্বাসী না হইলে টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত মাল ছাড়িয়া দেওয়া হয় না, ব্যাঙ্কের গুদামেই উহা জমা থাকে। এইরূপ ভাবে বিল বা হুণ্ডি (ইংরাজীতে ইহাকে bill of exchange বলা হয়) ভাঙ্গাইয়া ব্যাঙ্ক বহু টাকা রোজগার করে। টাকা আদায়ের ভার ব্যাঙ্ক গ্রহণ করায় বহুদূরবর্ত্তী বিদেশী ক্রেতাকে জিনিষ পাইবার

পূর্ব্বেই উহার মূল্য দিতে হয় না। পক্ষান্তরে বিক্রেতাও জিনিষ চালান করিয়াই ব্যাঙ্ক হইতে মূল্যের টাকাটা পাইয়া যায়। আবার ব্যাঙ্কও এই কাজ করিয়া একটা কমিশন ও টাকাটা আদায় কাল তক সুদ পাইয়া থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষে মধ্যস্থ হইয়া ব্যাঙ্ক দায়িত্ব গ্রহণ করে বলিয়াই দেশদেশান্তরে জিনিষের ও মূল্যের আদান প্রদান এত সহজে ও নিরাপদে হইতে পারে।

চেক ও বিলের পার্থক্য

চেকের সহিত বিলের পার্থক্য এই যে, চেক পাওনাদারের বরাবর দেনদার লিখিয়া দিয়া থাকে; কিন্তু বিল পাওনাদার তাহার ব্যাঙ্কের বা তৃতীয় ব্যক্তির বরাবরে লিখিয়া দেয়। দেনদার ঐ বিলে বা হুণ্ডিতে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দেনা স্বীকার করিয়া লয় এবং সাধারণতঃ তিন মাস মেয়াদ মধ্যে টাকাটা ব্যাঙ্ককে বা ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশানুযায়ী (to order) অপর ব্যক্তিকে পরিশোধ করিয়া দেয়। এই বিল চেকের ন্যায় হস্তান্তর করা চলে।

ট্রেজারী বিল

বিলের আলোচনা সম্পর্কে ট্রেজারি বিল সম্বন্ধে সংক্ষেপে এখানে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইলে এবং সেই ঘাটতি সত্বর পূরণ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণতঃ হয় ঋণ করিয়া নয়ত ট্যাক্স বসাইয়া, কিম্বা পুরাতন ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া এই টাকার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিশেষ প্রয়োজনে অথবা দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া আয় অত্যধিক হ্রাস প্রাপ্ত হইলেই এরূপ ঋণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সময় সময় চল্‌তি কাজকর্ম্মের জন্যও কর্ত্তৃপক্ষের সাময়িক অর্থাভাব ঘটিতে

পারে এবং অল্প সময়ের জন্য কিছু টাকা ধার করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। তখন যে দলিল মূলে গবর্ণমেণ্ট এই টাকা ধার করেন তাহাকে 'ট্রেজারি বিল' বলা হয়। ব্যাঙ্কগুলি ট্রেজারি বিল মূলে গবর্ণমেণ্টকে সাময়িক ঋণ দান করিয়া বেশ একটা আয় করিয়া থাকে। ট্রেজারি বিলের মেয়াদ (সাধারণতঃ তিন কিম্বা ছয় মাস) পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই টাকার প্রয়োজন হইলে, ব্যাঙ্ক এই বিল অন্যান্য শেয়ার ও সিকিউরিটির ন্যায় বিল-মার্কেটে বিক্রয় করিয়া সহজেই নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে।

বিল মার্কেট

বিলাতের ব্যাঙ্কগুলি আমেরিকার ব্যাঙ্কের ন্যায় ব্যবসায়ী বিল বা হুণ্ডির কাজ সাধারণতঃ মালিকের সহিত সোজাসুজি করে না। লণ্ডনের এই সব বিল ভাঙ্গাইবার কাজ করিবার জন্য বিলের দালাল (Bill Brokers) নামে পরিচিত বিশেষ এক শ্রেণীর লোক আছে। ইহারা যেখানে আফিস করিয়া কাজ করে তাহাকে বিল মার্কেট বলে। উহারা নিজ দায়িত্বে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিয়া বিল খরিদ করিয়া থাকে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সোজাসুজি বিল-লেখকদের (drawer) সাথেও ব্যাঙ্ক কাজ করিয়া থাকে।

শেয়ার মার্কেট

এই সম্পর্কে শেয়ার মার্কেট সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শেয়ারের বাজারে, যাহাকে ইংরেজিতে stock exchange বলা হয়, প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বেচাকেনা হইয়া থাকে। একদল লোক আছে যাহাদের ব্যবসা শুধু এই সব সিকিউরিটির বা দলিলের বেচাকেনা করা।

কোম্পানীর কাগজ ও যৌথ কারবারের শেয়ারের মূল্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের আর্থিক উন্নতি অবনতির সহিত অবিরত ওঠানামা করিয়া থাকে। অনেক সময় ভাগ্যান্বেষীদের নানারূপ কৌশলের দরুণও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। আদিতে যে শেয়ারের মূল্য একশত টাকা ছিল, আজ যাহার মূল্য বাজারে দেড় শত টাকা দাঁড়াইয়াছে, আগামী কল্য তাহার দর আরো চড়িয়া ১৬০৲ টাকা কিম্বা নামিয়া ১৪০৲ টাকা হইতে পারে। কোম্পানী বিশেষের লভ্যাংশ ভবিষ্যতে বৃদ্ধি হইবে মনে করিয়া অধিকতর লাভের আশায় অনেকে উহা চড়া মূল্যে কিনিতে থাকে; আবার কোন কোন কোম্পানীর অবস্থা ভবিষ্যতে খারাপ হইবে মনে করিয়া উহাদের মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাইবার পূর্ব্বেই অনেকে তাহাদের শেয়ার বিক্রয় করিয়া ফেলে। মালিকের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলেও এইরূপ বিক্রয়ের আবশ্যক হয়। এই সব বেচাকেনার কাজ করিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাদিগকে শেয়ারের দালাল, Share or Stock brokers, বলা হয়। ইহারা নিজেদের ও গ্রাহকদের জন্য শেয়ারের বেচাকেনা করিয়া থাকে এবং অপরের পক্ষে কাজ করিলে একটা কমিশন পাইয়া থাকে। কলিকাতার শেয়ার-বাজারে মাড়োয়ারী ও সাহেবেরাই প্রধানতঃ এই কাজ করিয়া প্রভূত অর্থ উপায় করে। এই কাজের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, দালালগণ নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে কিম্বা শেয়ার বন্ধক রাখিয়া উহা ব্যাঙ্ক হইতে অল্প দিনের মেয়াদে ধার করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক আমানত—চল্‌তি ও মেয়াদী

রকমারি বাড়িয়া গেলেও ব্যাঙ্কের কাজ মূলতঃ দুই প্রকার:

১। সর্ব্ব সাধারণের অর্থ গচ্ছিত বা আমানত রাখা।

২। ঐ অর্থ কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি দেশের নানাবিধ প্রয়োজনে নিয়োগ করা।

ব্যাঙ্কের আমানত সম্বন্ধে এখানে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমানত সাধারণতঃ দুই প্রকারের—চলতি (current deposit) ও মেয়াদী (fixed or time deposit)। চল্‌তি আমানত ইচ্ছামত যখন খুসী চেক্ দ্বারা তুলিয়া লওয়া যায়। ইহার জন্য ব্যাঙ্ক কোনরূপ সুদ দেয় না। মেয়াদী আমানত ছ' মাস, এক বৎসর বা দুই বৎসর, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয় এবং ঐ মেয়াদ মধ্যে উঠান যায় না। লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ 'ব্যাঙ্ক রেট'* অপেক্ষা দুই টাকা কম সুদে এই সব আমানত রাখিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক-রেট দুই টাকা হইলে মেয়াদী আমানতের জন্য দেড় টাকা পর্য্যন্ত সুদ দেওয়া হয়। বিলাতের মফঃস্বল ব্যাঙ্কগুলি আড়াই টাকা হারে সাধারণতঃ সুদ দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভাল হইলে অল্প সুদে ব্যাঙ্কে টাকা ফেলিয়া না রাখিয়া জনসাধারণ নানাবিধ কারবার ও ব্যবসায়ে টাকা খাটানই অধিকতর লাভজনক মনে করে এবং কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য চলতি হিসাবে টাকা জমা রাখাই শ্রেয় মনে করে। কিন্তু ব্যবসা মন্দা উপস্থিত হইলে অবস্থা হয় অন্যরূপ। ১৯২৯ সালের পর হইয়াছেও তাই। তখন কোনরূপ স্বাধীন কারবারে বা ব্যবসাবাণিজ্যে লাভের আশা অপেক্ষা ক্ষতির আশঙ্কাই বেশী হইয়া পড়ে এবং মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য হইতে যথা সম্ভব হাত গুটাইয়া ব্যাঙ্কে অল্প সুদে টাকা রাখা অধিকতর

---

*প্রত্যেক সপ্তাহে একটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড, বোর্ডের সভা করিয়া বিল ভাঙ্গাইবার জন্য কি হারে সুদ লওয়া হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করেন। ইহাকেই ব্যাঙ্ক রেট বলা হয়। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানত ও দাদনের সুদের হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন।

নিরাপদ মনে করে। তাই বিগত মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে, ব্যবসাবাণিজ্য যে সময়ে অসম্ভব রকম ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তখন (১৯১৯ সালে) মোট আমানতের শতকরা ৬৭ ভাগ ছিল চল্‌তি হিসাবে এবং ৩৩ ভাগ ছিল মাত্র মেয়াদী হিসাবে। তারপর ব্যবসার অবস্থা খারাপ হইতে সুরু হইলে, প্রতি বৎসর চল্‌তি আমানত কমিয়া বর্ত্তমান সময়ে উভয় আমানত প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে কম সুদে টাকা ধার পাওয়া আবশ্যক, উপযুক্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কের অভাবে আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইতেছে না, এই সত্য সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা অন্যরূপ। ১৯৩০ সাল হইতে যে ব্যবসা মন্দা সুরু হইয়াছে তাহাতে ইংরেজের ন্যায় ব্যবসায়ী জাতও এতটা ভীত হইয়া উঠিয়াছে যে অল্প সুদে ব্যাঙ্ক হইতে ধারের সুবিধা পাইয়াও উহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমন ভাবে নামিতে সাহস পাইতেছে না; তদপেক্ষা কোম্পানীর কাগজ, মেয়াদী ব্যাঙ্ক আমানতই পছন্দ করিতেছে। সেই জন্যই চল্‌তি আমানত মেয়াদী আমানতের দ্বিগুণেরও অধিক হইতে কমিতে কমিতে উহার সমান আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য কিছু দিন হইতে পুনরায় অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। এবং এক্ষণে আর একটা বিশ্বব্যাপী আসন্ন যুদ্ধের কালো মেঘ সারা দুনিয়ায় নূতন কর্ম্ম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক অবস্থাও নহে—বাঞ্ছনীয় ত নহেই।

আমানতের সহিত ব্যাঙ্কের ক্যাশ তহবিলের সম্পর্ক

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। মোট আমানতের শতকরা অন্যূন দশ টাকা নগদ তহবিল রাখার নিয়ম আমরা পূর্ব্বে

উল্লেখ করিয়াছি। এই নগদ তহবিল প্রকৃত প্রস্তাবে চলতি হিসাবের দাবী মিটাইবার জন্যই প্রয়োজন হয়। কারণ মেয়াদী হিসাবের দাবী সম্পর্কে সময় মত প্রস্তুত থাকা ব্যাঙ্কের পক্ষে অনেক সহজ। কিন্তু চলতি আমানতের জন্য কখন কত টাকার দাবী উপস্থিত হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের কতকগুলি বিশেষ সময় আছে যখন এইরূপ দাবী অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী হইয়া থাকে। বিলাতী ব্যাঙ্কগুলির বিগত দশ বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা চলতি আমানতের শতকরা ২০৲ টাকা (অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ) নগদ তহবিল রাখিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের চলতি ও মেয়াদী ব্যাঙ্ক-আমানত যদি সমান সমান হয়, তাহা হইলে মেয়াদী আমানতের জন্য ব্যাঙ্কগুলি কোন পৃথক তহবিলই রাখিতেছে না। কি প্রকারে—বলিতেছি। ধরা যাক্, ইংলণ্ডের মোট চলতি আমানত ১০০ পাউণ্ড ও মেয়াদী আমানত ১০০ পাউণ্ড, মোট ২০০ পাউণ্ড। আমাদের উল্লিখিত নিয়মানুসারে মোট আমানতের জন্য একদশমাংশ অর্থাৎ ২০ পাউণ্ড নগদ তহবিল রাখা প্রয়োজন। আবার চলতি আমানতের উপর যদি হিসাব করা যায় তাহা হইলে ১০০ পাউণ্ডের একপঞ্চমাংশেও ২০ পাউণ্ড নগদ তহবিল রাখিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মেয়াদী আমানতের জন্য পৃথক কোন নগদ তহবিল রাখার প্রয়োজন প্রকৃত প্রস্তাবে হয় না। চলতি হিসাবের একপঞ্চমাংশ তহবিল দ্বারাই উভয় বিধ প্রয়োজন সংসাধিত হয়।

ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ত্তব্য, সর্ব্বসাধারণের গচ্ছিত অর্থের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখিয়া কার্য্য করা। যে টাকা উহারা অপরকে ধার দিবে তাহা এমন ভাবে দেওয়া প্রয়োজন যাহাতে উহা যথা সময়ে

আদায় হইয়া আসিতে পারে, ইহার কোন একটা বড় অংশ কোথাও আবদ্ধ হইয়া না পড়ে। কারণ আমানতকারিগণ প্রত্যহ যে পরিমাণ ক্যাশ টাকা তুলিয়া লইবে, অন্ততঃ সেই পরিমাণ ক্যাশ টাকা বাহির হইতে আসা আবশ্যক—তা' ইহা নূতন ক্যাশ আমানতই হউক কিম্বা ধার শোধ দ্বারাই হউক। অন্যথা মোট আমানতের সহিত ক্যাশ তহবিলের নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্নহার এক দশমাংশ রক্ষিত না হইলে বিপদ উপস্থিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কারণ একটি মাত্র আমানতকারীও যদি তাহার গচ্ছিত অর্থ ফেরত চাহিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। সাধারণের পূর্ণ আস্থার উপরই ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব নির্ভর করে। যদি কোন কারণে এই বিশ্বাসের ভিত্তি কিঞ্চিন্মাত্রও শিথিল হয়, তাহা হইলে সমস্ত আমানতকারী এক সাথে টাকার জন্য ব্যাঙ্কের উপর যাইয়া পড়িবে এবং তখন বাধ্য হইয়াই তাহাকে গণেশ উল্টাইতে হইবে। তাই ব্যাঙ্কগুলিকে দুইটি বিভিন্ন এবং কথঞ্চিৎ বিপরীত স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া চলিতে হয়। একদিকে যাহারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় পরম বিশ্বাসের সহিত তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমানতকারিগণের একটি কপর্দ্দকেরও যাহাতে অপচয় না ঘটে, ইহা দেখা যেমন প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অবশ্য কর্ত্তব্য, অন্যদিকে দেশের ধনসম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, দেশের কৃষি- ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান যাহাতে দেশের সঞ্চিত অর্থে উত্তরোত্তর পুষ্টি ও উন্নতি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য উহার সদ্ব্যবহারও একান্ত প্রয়োজন।

কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন

ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ দেশের কৃষি ও শিল্প অনুষ্ঠানের মূলধনের জন্য টাকা দেয় না। নূতন কারবারের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সমস্ত টাকা নষ্ট হইবার সম্ভাবনাত রহিয়াছেই, অধিকন্তু এভাবে দীর্ঘকাল বহু অর্থ আটক করিয়া রাখাও নিরাপদ নহে। এই সব নূতন অনুষ্ঠানের মূলধন পূর্ব্বে ধনী ব্যবসায়িগণ নিজ নিজ সঞ্চিত তহবিল হইতে যোগাইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এক একটি বিরাট কারবারের মূলধন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সংস্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই ইংলণ্ডে এমন এক শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হইয়াছে যাহারা এই সব নূতন অনুষ্ঠানের মূলধন সর্ব্বসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় দ্বারা তুলিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে শেয়ার আণ্ডার-রাইটার্স বা ইসু হাউস বলা হয়। আর্থিক জগতে ইহাদের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি। ব্যাঙ্ক সোজাসুজি নূতন কোম্পানী সৃষ্টির জন্য টাকা ধার না দিলেও কিংবা তাহার অংশ ক্রয় না করিলেও, ইহাদিগকে টাকা ধার দিয়া থাকে এবং ইহারা এই অর্থের সাহায্যে নূতন নূতন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া দেয়—পরে আস্তে আস্তে সর্ব্বসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকাটা তুলিয়া লয় এবং তাহার জন্য একটা মোটা কমিশন পাইয়া থাকে। আমাদের দেশের ন্যায় শেয়ার বিক্রয়ের জন্য দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়া ইহাদিগকে হয়রান হইতে হয় না; ইহাদের নামের গুণে কয়েকদিনের মধ্যে, এমনকি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মোটা মূলধন উঠিয়া যায়। ব্যাঙ্কিং জগতে ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে তাহাদের এই অতি সাবধানতা এবং আমানতকারিগণের স্বার্থের প্রতি তাহাদের এই অতি সজাগ দৃষ্টি।

শাখা ব্যাঙ্কিং

এখানে বিলাতী ব্যাঙ্কের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার আছে। ভিন্ন ভিন্ন সহরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্ক করিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিলে শক্তি ও প্রসার লাভ করিতে পারা যাইবে না এবং লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতায়ও আঁটিয়া উঠিতে পারা যাইবে না বুঝিতে পারিয়া ইংলণ্ডের মফঃস্বল ব্যাঙ্কগুলি লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলির সহিত একে একে মিলিত হইয়া তাহাদের ব্রাঞ্চ হিসাবে কাজ করিতে আরম্ভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড ও ওয়েল্স প্রদেশে (স্কটলণ্ড বাদে) মোট ৭৭টি যৌথব্যাঙ্ক ছিল। ১৯১৩ সালে ইহাদের সংখ্যা ৪৩টিতে দাঁড়ায়। এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা মাত্র ১৬টি। এই ১৬টির মধ্যেও পাঁচটিই প্রধান।* ইহারা Big Five নামে বিশ্বময় পরিচিত এবং ইহাদের হাতেই আজ ঐশ্বর্য্যশালী ইংলণ্ডের অধিকাংশ ধনসম্পদ গচ্ছিত। মূলে ষোলটি ব্যাঙ্ক হইলেও ইহাদের শাখা প্রত্যেক নগরে ও বন্দরে রহিয়াছে। এইরূপ শাখা ব্যাঙ্কের সুবিধা এই যে, ইহারা বিভিন্ন স্থান হইতে আমানত সংগ্রহ করিতে পারে এবং ইহাদের মঙ্গলামঙ্গল স্থান বিশেষের উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে না। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যবসায় ও কারবারে টাকা খাটাইবার সুবিধা থাকায় স্থানবিশেষের বা ব্যবসাবিশেষের অবনতি ঘটিলেও তাহা ব্যাঙ্কের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে না। ইহাকে ইংরাজীতে spreading of risks বলা হয়। একই ঝুড়িতে সব ডিম না রাখিয়া বিভিন্ন ঝুড়িতে ডিমগুলি ভাগ করিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ দৈবাৎ যদি একটি ঝুড়ি নষ্ট হয়, তাহা হইলেও সকল ডিম নষ্ট হইবে

---

* ইহাদের নাম মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, লায়ড্স্ ব্যাঙ্ক, বারক্লেজ ব্যাঙ্ক, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক এবং ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ক।

না। এইরূপ ব্রাঞ্চ ব্যাঙ্কিঙের আরো একটি সুবিধা এই যে, অল্প ক্যাশ তহবিল লইয়া অধিক কাজ করা সম্ভব হয়। কারণ নিজেদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে চেক দ্বারা যে অর্থের আদান প্রদান হয় তাহার জন্য ক্যাশ টাকার প্রয়োজন হয় না। উভয়ের খাতায় শুধু জমাখরচ করিয়া লইলেই চলে। কিন্তু পরস্পর স্বাধীন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে এইরূপ কাজকর্ম্মে ক্যাশ টাকা দিবার সম্ভাবনা বেশী থাকিয়া যায়। এই বিষয়ে আমেরিকার ব্যাঙ্কিং রীতি ইহার বিপরীত। সে দেশে বিভিন্ন নিয়ম কানুনের অধীন ব্যাঙ্কের সংখ্যা বহু সহস্র। ১৯২৯ সালে ব্যবসা মন্দা সুরু হইলে এবং বিশেষভাবে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস পাইলে, আমেরিকায় শত সহস্র ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া হইতে হয়। ঐ একই কারণে বাংলা দেশের শত শত লোন কোম্পানী ও মফঃস্বল ব্যাঙ্ক আজ মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে।

যৌথ ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্য

বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর লোক বিলাতী ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ নিখুঁত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। ছোট ছোট শহরেও প্রত্যেক বৃহৎ ব্যাঙ্কের একটি করিয়া শাখা থাকায় তাহাদের মধ্যে টাকা আমানত ও দাদন ব্যাপারে অন্যায় রেষারেষি ও প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা থাকিয়া যাইতেছে। একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে শক্তির অতিরিক্ত টাকা ধার করিবার সুযোগ লাভ করিতেছে এবং আমানত সংগ্রহ ব্যাপারেও অশোভন আগ্রহাতিশয্যের সৃষ্টি হইতেছে। এই পরিস্থিতি ব্যাঙ্কের স্বার্থের পক্ষে যেমন অনুকূল নহে তেমনি সাধারণের পক্ষেও হিতকর নহে। ব্যাঙ্কের লেন-দেন সম্পূর্ণ গোপন রাখিবার রীতি। তাই কাহার কোন্ ব্যাঙ্কে কত টাকা জমা

বা ধার আছে তাহা অপর কাহারো জানিবার উপায় নাই। ১৯২৯ সালের পর বহু কারবার যখন দেউলিয়া হইয়া যায় তখন দেখা গেল, ইংলণ্ডের অতি সাবধানী হুঁশিয়ার ব্যাঙ্কগুলিরও বহু অর্থ এই সব কারবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, মূলধন বাবদ এই সব অর্থ দাদন করা হয় নাই; কারবারের চল্‌তি খরচের জন্যই ধার দেওয়া হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে যে সহযোগিতার অভাব এই ক্ষতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই আবার এই সব নষ্ট অর্থ উদ্ধারের জন্য সম্মিলিত চেষ্টার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কই নিজ নিজ অর্থ উদ্ধারের জন্য আপন আপন স্বার্থ অনুসরণ না করিয়া যদি একযোগে সম্মিলিত চেষ্টা করিতে পারিত, তাহা হইলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াও নিজেদের অর্থ ফিরিয়া পাওয়া হয়ত অসম্ভব হইত না।

বর্ত্তমান ব্যবস্থার আরও একটি ত্রুটি ইহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে সহযোগিতার অভাবে দেশের কৃষি- ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের প্রয়োজন মত হিসাব করিয়া অর্থ সাহায্য করা সম্ভবপর হয় না। কোন কোন কারবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ পাইয়া থাকে, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের ন্যায্য দাবীও উপেক্ষিত হয়। আধা-সরকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মোট দাদনের (credit-এর) পরিমাণ গৌণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সক্ষম হইলেও, কাহাকে কি বাবদে কত টাকা দেওয়া হইবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। এইজন্যই এক শ্রেণীর লোক এই দাবী উপস্থিত করিয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মারফতে মুদ্রা ও নোটের সংখ্যা (amount of currency) যেরূপ একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইতেছে, সেইরূপ ঋণ (credit) নিয়ন্ত্রণের ভারও কতকগুলি

সম্পূর্ণ স্বাধীন যৌথ ব্যাঙ্কের উপর না রাখিয়া একটি মাত্র কেন্দ্রীয় শক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর্থিক জগতে মুদ্রা ও নোট অপেক্ষা ক্রেডিটই আজ অধিকতর শক্তিশালী। কারণ ক্রেডিট মূলে বর্ত্তমান দুনিয়ায় যে পরিমাণ অর্থের কাজ হইতেছে, তাহা মুদ্রা ও নোটের তুলনায় বহুগুণ অধিক। সুতরাং এই বিরাট শক্তিকে বিচ্ছিন্ন, অসংযতভাবে নিয়োজিত হইতে না দিয়া একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ব্যবসাবাণিজ্য ও মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের অনেক বেশী উপকার হইতে পারিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তির বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলেই Socialisation of Banking বা সমাজতন্ত্রের কথা আসিয়া পড়ে। সে আর এক দীর্ঘ কাহিনী।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

ইহার প্রাচীনত্ব

দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ভারতীয় যৌথ-ব্যাঙ্কের সংখ্যা আজ পর্য্যন্ত নিতান্ত নগণ্য হইলেও ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে ব্যাঙ্কিং প্রথা এ দেশে প্রচলিত ছিল না ইহা মনে করিলে গুরুতর ভুল করা হইবে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মনুর সময় হইতে আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর প্রায় অধিকাংশ রীতিনীতিই বিস্তৃত ভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সর্ব্বসাধারণের অর্থ ও তৈজসাদি গচ্ছিত রাখা, সাধারণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধরিয়া টাকা ধার দেওয়া, হুণ্ডি কাটা, চালানীমাল বীমা করা, জাবেদা খাতা (day book), নগদান খাতা (cash book) ও খতিয়ান (ledger) সাহায্যে অতি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে শৃঙ্খলার সহিত হিসাব রাখা, এই সবই তাহারা জানিত ও করিত। এতদ্ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন রাজন্যবর্গের স্বতন্ত্র মুদ্রা থাকায় ঐসব মুদ্রার বিনিময় ও মূল্য নির্দ্ধারণ করাও দেশীয় মহাজন বা সাহুকরদের একটি প্রধান কাজ ছিল—যেমন অধুনা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ পাশ্চাত্য এক্‌শ্চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি করিয়া থাকে। খৃষ্টজন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও আমরা আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর প্রায় সর্ব্ববিধ কার্য্য বিবরণ দেখিতে পাই। ইহা জাতীয় গর্ব্বপ্রসূত মিথ্যা অহঙ্কার নহে, ইংরেজ পণ্ডিতগণই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমান আক্রমণের সূচনায় ভারতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে ব্যাঙ্কিং-এর প্রতিপত্তি ও প্রসার স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। জনসাধারণ তখন মহাজন ও বণিকদের নিকট ধন-

সম্পত্তি গচ্ছিত না রাখিয়া নিজেদের নিকটে নানা গোপন উপায়ে সঞ্চিত রাখাই অধিকতর নিরাপদ মনে করিত। অবশ্য সেই সময়েও বিভিন্ন রাষ্ট্র সমূহকে প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের সহিত কোন মহাজন বা শেঠ পরিবারের সংশ্রব থাকিত এবং তাহারাই ঐ সব রাজ্যে অর্থ-সচিবের পদ অধিকার করিতেন। বাংলার নবাবগণের বংশানুক্রমিক ব্যাঙ্কার ছিলেন জগৎশেঠের পরিবার। এজেন্সী হাউসের সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেও ইহাদের নিকটই টাকা ধার করিতে হইত।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ব্যাঙ্কিঙে পার্থক্য

আধুনিক ব্যাঙ্কিঙের সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কিঙের পার্থক্য এইখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

(ক) আধুনিক ব্যাঙ্কগুলির পুঁজি সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অংশ বিক্রয় ও আমানত গ্রহণ করিয়া তোলা হয় এবং অংশীদারগণের দেনা বা দায়িত্ব তাহাদের অংশের পরিমাণ অবধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু পুরাতনপন্থী মহাজন ও বাণিয়াগণ বেশীর ভাগ নিজের অর্থ দ্বারাই মহাজনী ও ব্যাঙ্কিং কাজ-কারবার পরিচালনা করিয়া থাকে এবং তাহার দায়িত্বও ঐরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

(খ) দেশীয় মহাজনদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা শুধু ব্যাঙ্কিং-এর কাজই করে না, সঙ্গে সঙ্গে আমদানি, রপ্তানি, 'রাখি' কারবার এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যেও লিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ হইলেও 'টমাস কুক', 'পি, এণ্ড ও' ব্যাঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ব্যাঙ্কিং-এর সহিত অন্যান্য নিরাপদ ব্যবসা, কিংবা ব্যাবসার সহিত ব্যাঙ্কিং পাশ্চাত্য দেশেও খানিকটা আছে।

(গ) দেশীয় সাহুকরদের কাজকর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্য ব্যাঙ্ক-রীতির আরো দুইটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারে প্রভেদ রহিয়াছে। আইনতঃ কোন বিধিনিষেধ না থাকিলেও এই সব দেশীয় সাহুকর, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ স্বর্ণকার-ব্যাঙ্কারদের মত, কখনো নোট প্রচলন করে নাই। চেকের সাহায্যে ক্লিয়ারিং হাউস মারফতে দেনা পাওনা মিটাইবার সহজ ব্যবস্থাও ইহাদের নাই। অবশ্য হুণ্ডিদ্বারা বহুকাল হইতে ইহারা আংশিকভাবে চেকের কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু আধুনিককালে চেকের সহায়তায় অর্থের প্রয়োজন যে ভাবে সংসাধিত হইতেছে, দেশীয় হুণ্ডিদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সমপরিমাণে কখনো সাধিত হইতে পারে না। এই জন্যই দুই-চারিটি চেট্টি বা শেঠজীর নাম বাদ দিলে আর সকলে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যের কর্তৃত্ব আজ পরহস্তগত।

বর্ত্তমান সময়ে যদিও ভারতের বড় বড় নগরে ও বন্দরে বৃহৎ আধুনিক ব্যাঙ্ক ও তাহাদের শাখা প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে জাঁকজমকের সহিত বহু টাকার কাজ কর্ম্ম করিতে আমরা দেখিতে পাই, তথাপি এখনো ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে দেশীয় মহাজনদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিতান্ত নগণ্য নহে। বিদেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রায় ষোল আনাই যোগাইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক আজও তেমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতের ন্যায় পল্লীপ্রধান মহাদেশের অগণিত কাজ কারবারের পক্ষে ইহাদের আয়োজন এবং ব্যবস্থা মোটেই প্রচুর ও যথেষ্ট নহে। কারণ বড় বড় নগর ও বন্দর ব্যতীত ভারতের অসংখ্য জনপদের সহিত ইহাদের কোনরূপ সংস্রব নাই। তাই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের

জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দাবী এই সব দেশীয় মহাজনই আজও পূরণ করিয়া আসিতেছে। কৃষক, কারিগর, ক্ষুদ্র দোকানদার বা ব্যবসায়িগণকে ইহারাই প্রয়োজন মত অর্থ দাদন দিয়া থাকে। কৃষিপ্রধান দেশের কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করিয়া ইহারাই শহরে বন্দরে চালান দিয়া থাকে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য পল্লীগ্রামের হাটে গঞ্জে ইহাদের অর্থানুকূল্যেই আমদানি হইয়া থাকে। কৃষকের চাষের খরচ ইহারাই জোগাইয়া থাকে এবং ফসলের সময় উপস্থিত হইলে উহা খরিদ ও চালানের জন্য ইহারাই নগদ টাকা সহ গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হয়। আজকাল ইহাদের অনেকে নগদ টাকার পরিবর্ত্তে সরকারী হুণ্ডি খরিদ করিয়া রাখিতে শিখিয়াছে; কারণ দাদন বা মাল খরিদের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে ইম্পিরিয়াল কিম্বা অন্য কোন যৌথ ব্যাঙ্কে উহা সহজেই ভাঙ্গাইয়া লওয়া চলে। শহরের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে মফঃস্বলের অসংখ্য ব্যবসায়ীর সম্পর্কে আসিবার এবং তাহাদের অবস্থা জানিবার সুযোগ বা সুবিধা হয় না। সেই জন্যই ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত বড় কারবারী ভিন্ন অপর কাহাকেও টাকা দাদন দেওয়া ইহাদের পক্ষে তেমন সহজ ও সম্ভবপর নয়। এতদ্ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণ আমানতের জন্য উচ্চতর হারে সুদ দেয় এবং অপেক্ষাকৃত সহজ সর্ত্তে টাকা ধার দেয়। এই সব কারণে ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নিতান্ত কম প্রশস্ত নহে এবং বড় বড় যৌথ ব্যাঙ্কের ইহারা নিতান্ত নগণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

আবার অন্য ভাবে দেখিতে গেলে, রাজধানীর টাকার বাজার এবং পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ব্যবসায়ী ও চাষীর মধ্যে ইহারাই যোগস্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। সুদূর পল্লী-জমির ফসল কোন পথে কি উপায়ে শহরে চালান হয় তাহার অনুসন্ধান লইলেই এই কথার সঙ্গতি

বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব, গ্রাম্য ছোট ব্যাপারী প্রথমতঃ তাহার সামান্য পুঁজি হইতে নগদ অর্থ দ্বারা পণ্য খরিদ করিতেছে। যখন তাহার পুঁজী নিঃশেষিত হইয়া আসে, তখন সে তাহার ক্রীত পণ্যের মাতব্বরিতে নির্দ্দিষ্ট একটা সময় মধ্যে পরিশোধ করিবার কড়ারে (সাধারণতঃ ত্রিশ কিংবা ষাট দিন) গঞ্জের মহাজন হইতে টাকা ধার করে। আবার গঞ্জের মহাজন, টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহার অপেক্ষা বড় মহাজনের নিকট তাহার খরিদা পণ্য জিম্মা রাখিয়া এবং গ্রাম্য মহাজনের হুণ্ডি বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই মহাজন আবার ঐ হুণ্ডিতে স্বাক্ষর করিয়া উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সহরের ব্যাঙ্কে তাহা বিক্রয় করতঃ নগদ অর্থ পাইতে পারে। এই উপায়ে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যাপারী বা মহাজনের সহিত সহরের আধুনিক ব্যাঙ্কের যোগসূত্র গৌণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক হিসাবে, পাশ্চাত্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দেশীয় মহাজনী কারবারের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে নগদ টাকাকড়ি পাঠাইবার হাঙ্গামা হইতে ইহারা রক্ষা পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, প্রয়োজন মত অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহের সহজ সুযোগও ইহারা অনেকটা লাভ করিয়াছে। ব্যবসাদারদের হুণ্ডি ক্রয় করিবার সময় ইহারা “ব্যাঙ্ক রেট” অপেক্ষা শতকরা ২৲।৩৲ টাকা অধিক বাট্টা ধরিয়া লয় এবং উহা পুনরায় ব্যাঙ্কের নিকট “ব্যাঙ্ক-রেট”-এ বিক্রয় করিয়া থাকে। এইভাবে মাঝ হইতে ইহাদের শতকরা ২৲।৩৲ টাকা লাভ থাকিয়া যায়। গ্রাম্য ব্যবসায়ীর হুণ্ডি সোজাসুজি সহরের ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিতে রাজী হয় না, ধনী ও পরিচিত মহাজন ঐ সব হুণ্ডি স্বাক্ষর করিয়া টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তবেই সহরের ব্যাঙ্ক উহা গ্রহণ করে। সেই জন্যই এই সব মহাজনের পক্ষে

হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয় দ্বারা এই লাভের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। সনাতনপন্থী অনেক মহাজন আজকাল তাহাদের ব্যবসাকে আধুনিক ছাঁচে রূপান্তরিত করিতেছে এবং অনেকে চেকের প্রচলন পর্য্যন্ত সুরু করিয়াছে।

এজেন্সী হাউস, প্রথম যৌথব্যাঙ্ক ও আধাসরকারী প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক

ভারতে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ব্যবসা করিবার জন্য যে সব "এজেন্সী হাউস" এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম একটি ব্যাঙ্কিং বিভাগ খোলেন। নীলকুঠি, অন্যান্য ফ্যাক্টরী, পণ্যবাহী জাহাজ ইত্যাদি জামিন রাখিয়া ইহারা ইংরেজ ও দেশীয় কুঠীয়াল ও ব্যবসায়ীদিগকে টাকা দাদন করিতেন। আমানতী সুদের হার উচ্চ হওয়ায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ এই সব এজেন্সী হাউসে গচ্ছিত রাখিতেন। কিন্তু ইহারা অধিক লাভের আশায় নানাবিধ দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮৩০-৩২ সালে ব্যবসাসঙ্কট উপস্থিত হইলে উহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। "ব্যাঙ্ক অব্ হিন্দুস্থান" নামে কলিকাতা সহরে ভারতে যে সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী যৌথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাও ১৮৩০-৩২ সালের দুঃসময়ে উঠিয়া যায়। তৎপর কলিকাতার কয়েক জন বড ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" নামে আরেকটি বেসরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৪৮ সালে তাহার অস্তিত্বও লোপ পায়। এদিকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদমূলে ১৮০৬ সালে ভারতের প্রাচীনতম প্রাদেশিক যৌথ ব্যাঙ্ক, "ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ৫০

লক্ষ টাকার মূলধন মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোগাইয়াছিলেন। "ব্যাঙ্ক অব্ বোম্বে"র প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৪০ সালে, ৫২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া। কিন্তু শেয়ার স্পেকুলেশনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ১৮৬৮ সালে উহা উঠিয়া যায়। তৎপর ঐ বৎসরই এক কোটি টাকা মূলধন লইয়া "ব্যাঙ্ক অব্ বোম্বে"র দ্বিতীয়বার গোড়াপত্তন হয়। ১৮৪৩ সালে ৩৬ লক্ষ টাকা মূলধনে মাদ্রাজের প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসব প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের অবস্থা অনেকটা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের মত ছিল। প্রথমতঃ, ইহাদের মূলধন আংশিক ভাবে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোগাইয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারী এই সব ব্যাঙ্কে সম্পাদক (সেক্রেটারী) ও কোষাধ্যক্ষের পদ অধিকার করিতেন এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই কতিপয় পরিচালক (ডিরেক্‌টার)ও মনোনয়ন করিতেন। ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারী কাজকর্ম্ম এই সব প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক মারফতে সম্পন্ন হইত।

১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত নোট প্রচলনের অধিকারও এইসব প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের হাতে ছিল। কিন্তু এই সময়ে ঐ অধিকার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে সরকারী তহবিল এই সব প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে রক্ষিত হইতে থাকে।

"প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক আইন" মূলে ১৮৭৬ সালে গবর্ণমেণ্ট এই সব ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের প্রদত্ত মূলধন তুলিয়া লয়েন এবং পরিচালক, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনয়ন বা নিয়োগের অধিকার পরিত্যাগ করেন। ইহার ফলে সরকারী সংশ্রব অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাময়িক ঋণগ্রহণের বন্দোবস্ত করা, সরকারী তহবিলের একটি ন্যূনতম অংশ গচ্ছিত রাখা ইত্যাদি কর্ম্মভার তখনও

ইহাদের উপর ছিল। এতদ্ভিন্ন ইহাদের হিসাব পরীক্ষা করা, কোন বিষয়ে সংবাদ বা তথ্য দাবী করা, সাপ্তাহিক হিসাব প্রকাশে ইহাদিগকে বাধ্য করা, ১৮৭৬ সালের আইনমূলে সরকারী অধিকারের অন্তর্ভূক্তি ছিল।

১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিন প্রাদেশিক রাজধানীর সরকারী তহবিল প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কেই থাকিত। কিন্তু এইসব ব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজন মত মফঃস্বলে টাকা পাঠাইতে নানারূপ অসুবিধা ঘটিতে থাকায়, ১৮৭৬ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরীতে গবর্ণমেণ্ট নিজেদের রিজার্ভ ট্রেজারী (খাজানাখানা) স্থাপন করেন। এই সময় হইতে সরকারী তহবিলের অধিকাংশ অর্থই এই সব খাজানাখানায় রক্ষিত হইত—দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের জন্য আবশ্যকীয় সামান্য তহবিলমাত্র জেলা ট্রেজারীতে (বা খাজানাখানায়) থাকিত। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে সরকারী তহবিল গচ্ছিত রাখিবার যে ন্যূন পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা কম অর্থ ঐ সব ব্যাঙ্কে রাখিলে গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য ঘাটতি তহবিলের উপর একটা সুদ দিতে স্বীকৃত হন। কার্য্যক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট ন্যূন পরিমাণ অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থই এই সব ব্যাঙ্কে গবর্ণমেণ্টের গচ্ছিত থাকিত। কলিকাতা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ এই ছয়মাস কেনাবেচার কাজ জোরের সহিত চলিয়া থাকে এবং অর্থের প্রয়োজনও এই সময়ে বেশী হয়। বাঙ্গলা দেশে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, এই চারি মাসই কৃষিজাত পণ্য ও অন্যান্য জিনিষের কেনাবেচার মরশুম। আবার অন্যদিকে সরকারী রাজস্বের বেশীর ভাগ আদায় হয় পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্যবসার মরশুমের সময়,

যখন টাকার বাজারে অধিক অর্থের প্রয়োজন, সেই সময়ে বহু অর্থ রাজস্ব বাবদ সরকারী তহবিলে আসিয়া জমা হইতে থাকে। এই অর্থ সারা বৎসরের খরচ বাবদ গবর্ণমেণ্ট ধরিয়া রাখেন। ফলে টাকার বাজারে ব্যবসার জন্য অর্থের অনটন ঘটে।

ব্যাঙ্কিং ও সরকারী তহবিল

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্বল্প দিনের মেয়াদে সরকারী তহবিল হইতে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের মারফতে জনসাধারণকে টাকা ধার দিবার একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এই কথা বলা হয় যে, আকস্মিক কোন কারণে টাকার প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টকে বিপদে পড়িতে হইবে এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় এরূপ সম্ভাবনা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণ তাহাদের নিজ সঞ্চিত অর্থ-দ্বারা ব্যবসা না করিয়া যদি সহজ লভ্য ধারের টাকায় ব্যবসা করিবার সুবিধা পায় তাহা হইলে ব্যবসার পক্ষেও ইহা পরিণামে মঙ্গলজনক হইবে না। অনেক আন্দোলনের পর ভারতসচিব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন বটে, কিন্তু সরকারী টাকার জন্য প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যাঙ্ক রেটে সুদ দিতে হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া আনিয়া উহা পুনরায় ব্যবসায়ী মহলে ধার দিয়া সুবিধা হইবেনা মনে করিয়া প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি এই সর্ত্তে সরকারী টাকা লইতে অসম্মত হয়। চেম্বারলেন কমিশন (১৮১২-১৩ সাল) এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন: হয় সরকারী খাজানাখানা (Reserve Treasury) উঠাইয়া দিয়া সরকারী তহবিল এই সব

প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে রাখা হউক ; নয়ত “ব্যাঙ্ক রেট” অপেক্ষা শতকরা এক কিম্বা দুই টাকা কম সুদে প্রেসেডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী অর্থ ধার দেওয়া হউক। সাধারণ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট জনমতকে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করিলেও বিগত লড়াইয়ের সময় নিজ স্বার্থের জন্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইলে, গবর্ণমেণ্ট সরকারী তহবিল হইতে বহু টাকা প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক সমূহের হস্তে অর্পণ করেন—উদ্দেশ্য ক্রেডিট মূলে এই টাকা জন সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে তাহারা অনায়াসে সমরঋণ বাবদ গবর্ণমেণ্টকে টাকা ধার দিতে পারিবে। বহু আন্দোলনে যাহা সম্ভব হয় নাই, বিগত যুদ্ধের ফলে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। অবশেষে ১৯২১ সাল হইতে রিজার্ভ ট্রেজারী তুলিয়া দিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কেই সরকারী টাকা গচ্ছিত রাখা হয়।

সর্ব্বসাধারণের অর্থ গচ্ছিত রাখা, গবর্ণমেণ্টের, মিউনিসিপ্যালিটির কিংবা অন্যান্য কতকগুলি নির্ভরযোগ্য নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র মূলে টাকা ধার দেওয়া, হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয় করা, নিরাপত্তার জন্য মূল্যবান সিকিউরিটি গচ্ছিত রাখা, গবর্ণমেণ্ট ও কতকগুলি বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে ধারের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমূহের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। কিন্তু এই সব ব্যাঙ্কের বিদেশী অর্থ কেনাবেচা করিবার কিম্বা বিদেশ হইতে টাকা ধার করিবার অধিকার ছিল না। এমন কি, কি পরিমাণ অর্থ দাদন দেওয়া হইবে, কত দিনের মেয়াদে দেওয়া হইবে, কি জাতীয় জামিন মূলে দেওয়া হইবে, তৎসম্বন্ধে ইহাদের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ ছিল। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত গবর্ণমেণ্টের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ইহাদের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা জনসাধারণের নিকট খুবই উঁচু ছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সরকারী তহবিলের একটা বড় নির্দ্ধারিত অংশ

ব্যাঙ্কে আমানত থাকিত। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যাদি এই সব ব্যাঙ্কই সম্পন্ন করিত। এই সব কারণে ইঁহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে একাধিপত্য লাভ করা সহজ হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব

কিন্তু নোট প্রচলন ও মুদ্রা সম্পর্কীয় অন্যান্য যাবতীয় বিলিব্যবস্থার ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকায় এবং প্রাদেশিক আধাসরকারী ব্যাঙ্কগুলির সহিত অন্যান্য যৌথ ব্যাঙ্কের ও মফঃস্বলের মহাজনগণের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকায় টাকার বাজারে একটা অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। কোন সময়ে ব্যবসার অনুপাতে টাকার বাজারে অর্থাভাব ঘটিতেছিল, আবার কোন সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বাজারে ছড়াইয়া পড়িয়া জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ও আনুসঙ্গিক অসুবিধা ঘটাইতেছিল। এমন কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না যাহা ধার (ক্রেডিট) বা মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারে। লড়াইয়ের পর ১৯২০ সালে ব্রুসেল্‌স্‌ নগরে যে আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসে তাহাতে যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই সেই সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ভিন্ন কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহাও ঐ বৈঠকে স্বীকৃত হয়। ইহার ফলে আমেরিকায় ও য়ুরোপের যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব ছিল সেই সব দেশে কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ ব্যাঙ্কের অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। একদিকে গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল সরকারী তহবিল, নোট প্রচলনের ক্ষমতা ও বিদেশের

সহিত অর্থ আদান-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা। অন্য দিকে ব্যাঙ্কগুলির হাতে ছিল তাহাদের স্বতন্ত্র তহবিল। এই দুইটি বিভিন্ন আর্থিক শক্তির মধ্যে কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক না থাকায় টাকার বাজারে উল্লিখিত অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইতেছিল। এই সহযোগিতার অভাবে অনেক ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল আকস্মিক প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর না হওয়ায় উহাদের বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইতেছিল। ১৯১৩—১৪ সালে কতকগুলি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় এবং আর্থিক ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের যথোচিত অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি না থাকায়, বিশেষজ্ঞ পরিচালিত একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর অনুভূত হয়। এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের সহযোগিতায় একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিতর দিয়া দেশের যাবতীয় আর্থিক বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবে; ফলে সরকারী ও বে-সরকারী ধনভাণ্ডার দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারিবে; জিনিষের মূল্য ও বিনিময়ের হার স্থির রাখার যে অত্যধিক আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে তাহা সুসাধ্য হইবে; বে-সরকারী ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের টাকার প্রয়োজন হইলে কিংবা আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাদের একটা আশ্রয়স্থল মিলিবে—ইহাই ছিল ভারতবাসীর এই দাবীর গোড়ার কথা।

একশত বৎসর পূর্ব্বে, ১৮৩৬ সালে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব কয়েকজন ব্যবসায়ী উপস্থিত করিয়াছিলেন। তৎপর ১৮৬৭ সালে তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া একটি নিখিল ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের তৎকালীন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ডিক্‌সন্ সাহেব করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা

করেন। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জ্জন এই বিষয়টি পুনরায় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ কিছুই হইয়া উঠে নাই। ১৯১২—১৩ সালে চেম্বারলেন কমিশনের স্বনামখ্যাত সদস্য কেইন্‌স্ সাহেব তিনটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একত্র করিয়া একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং এইরূপ ব্যাঙ্কের একটি খসড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত করেন। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজেদের স্বাধীন সত্তা এই ভাবে লোপ করিয়া সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিতে সম্মত হন নাই; এবং প্রথম হইতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইঁহারা অসম্মত হইলে পাছে গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন পুরাদস্তুর সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন এবং ইঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে এ যাবৎ যে সব সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা অবশেষে তিনটি ব্যাঙ্কের সম্মিলনে ও অন্যান্য সর্ত্তে সম্মত হন। তাহারই ফলে যুদ্ধাবসানের পর ১৯২১ সালে মিঃ কেইন্‌স-এর প্রস্তাবানুযায়ী তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য মোটেই সাধিত হয় নাই; কেমন করিয়া তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং (২)

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ১৯২১ সালে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সমস্ত সম্পত্তি ও দায় গ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ব্ব পরিচালকগণই (Directors) নিজ নিজ প্রদেশে পরিচালকরূপে অধিষ্ঠান করিতে থাকেন। প্রাদেশিক পরিচালক বোর্ডের উপরে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বোর্ডের সভ্যগণ বৎসরে একবার কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ সহরে সমগ্র ব্যাঙ্কের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সম্মিলিত হইতেন। তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে রেষারেষি থাকায় তিনটি ব্যাঙ্ককেই এইরূপ সমভাবে কৃতার্থ করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির সম্মিলিত মূলধন সাত কোটি টাকা ছিল। এই সব ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের অংশীদার রূপে গ্রহণ করা হয় এবং শেষোক্ত ব্যাঙ্কের মূলধন ১৫ কোটি টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। মূলধনের অতিরিক্ত টাকা নূতন অংশ বিক্রয় করিয়া তোলা হয় এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমূহের অংশীদারগণকে তাহাদের পুরাতন অংশের দ্বিগুণ পরিমাণ নূতন অংশ কিনিবার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০০৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হয় :—

(১) কেন্দ্রীয় বোর্ডের মনোনয়ন অনুযায়ী বড় লাটের নিয়োজিত দুই জনের অনধিক ম্যানেজিং গবর্ণর। বড় লাটের ইচ্ছার উপর তাঁহাদের কার্য্যকাল নির্ভর করিত।

(২) অংশীদারগণের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনটি প্রাদেশিক বোর্ডের সভাপতি, সহঃ সভাপতি এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ।

(৩) বড় লাটের মনোনীত কারেন্সী কণ্ট্রোলার কিম্বা ঐরূপ কোন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী একজন।

(৪) করদাতা ও সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ দেখিবার জন্য বেসরকারী সভ্য চারি জন।

স্থানীয় বোর্ড স্ব স্ব প্রদেশে ব্যাঙ্কের সাধারণ কাজকর্ম্ম সম্পাদনে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিত। ব্যাঙ্কের মূল নীতি নির্দ্ধারণ করা, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অর্থের পরিমাণ বরাদ্দ করা, ব্যাঙ্কের সুদের হার ঠিক করা, সাপ্তাহিক আয়ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা, প্রাদেশিক বোর্ডের কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধান করা—এই সব কাজ ছিল কেন্দ্রীয় বোর্ডের অন্তর্গত। জনসাধারণের মূলধনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ইহাদিগকে একদিকে যেমন বেসরকারী ব্যাঙ্ক মনে করা যাইতে পারে, অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আইনমূলে ইহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সরকারী তহবিল ইহাতে রক্ষিত হওয়ায়, সরকারী কাজ কর্ম্ম ইহার মারফতে সম্পন্ন হওয়ায় এবং ইহা বহুলাংশে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায় ইহাকে সরকারী ব্যাঙ্কও বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত এইদিক দিয়া ইহার সাদৃশ্য থাকিলেও, অন্যান্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির ন্যায় ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। যথা, বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা করা, বিদেশ হইতে আমানত সংগ্রহ করা, স্থাবর সম্পত্তিমূলে বা ছ'মাসের অধিক কালের জন্য টাকা ধার দেওয়া, অন্যূন দুইজন ব্যক্তির জামিন ব্যতীত শুধু ব্যক্তিগত মাতব্বরিতে টাকা ধার দেওয়া ইত্যাদি কাজ কর্ম্ম ইহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ভিন্ন

ভারতের বাহিরে পরিশোধনীয় হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় করিবার অধিকারও ইহার ছিল'না।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পর গবর্ণমেণ্টের সমুদয় তহবিল কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে ও তাহাদের শাখা আফিস সমূহে রক্ষিত হইত। যে যে জেলা বা মহকুমায় ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না, সেই সেই স্থানে দৈনন্দিন প্রয়োজন অনুযায়ী তহবিল সরকারী ট্রেজারিতে রাখিয়া বাকী অর্থ এলাকাভুক্ত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে চালান করা হইত। সরকারী ঋণ সম্পর্কীয় সমুদয় কর্ম্ম, যথা হিসাবাদি রক্ষা করা, ঋণের সুদ দেওয়া, আবশ্যক হইলে নূতন ঋণ বিলি করা ও তজ্জন্য টাকা গ্রহণ করা ইত্যাদি ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক মারফতেই সম্পন্ন হইত। এই সব কাজ কর্ম্মের জন্য ব্যাঙ্ক অবশ্য গবর্ণমেণ্ট হইতে একটা কমিশন পাইত। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমূহের মোট ৫৯টি শাখা ছিল। কিন্তু ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর আরো ১০২টি শাখা খোলা হয়। যে সব স্থানে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের শাখা আছে সেই সব স্থানে জনসাধারণ যাহাতে ব্যাঙ্ক মারফতে অল্প খরচে টাকা পাঠাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব্বে এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শতকরা ।০ আনা কমিশন দিতে হইত। সেই স্থলে শতকরা এক আনা কমিশনে টাকা পাঠাইবার সুবিধা সর্ব্বসাধরণকে দেওয়া হয়। পরে উহা আরো হ্রাস করিয়া ৴১০ আধ আনা করা হয়। পূর্ব্বে অধিক কমিশন দিয়া গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারি মারফতে এই কাজ করিতে হইত। কিন্তু ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পর যে যে স্থানে এই ব্যাঙ্ক আছে, সেই সেই স্থানে ট্রেজারি মারফতে টাকা পাঠানো গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, এই সব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বা ট্রেজারির প্রত্যেকবার নগদ টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হইত না।

টাকা দাখিল করিয়া প্রেরক একখানা ড্রাফ্‌ট্‌ বা ‘পে অর্ডার’ প্রাপ্ত হইতেন এবং প্রাপক তাহার স্থানীয় ব্যাঙ্ক বা ট্রেজারি হইতে উহা ভাঙ্গাইয়া লইতেন।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের দোষ-ত্রুটি

কিন্তু ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা শাখা ব্যাঙ্কের প্রসার, উচ্চতর ব্যাঙ্কিং প্রথার খানিকটা প্রচার হইলেও, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই ; ভারতের জনমত অন্যান্য স্বাধীন দেশের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃত্বাধীনে যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান আশা করিয়াছিল সে আশা তাহাদের পূর্ণ হয় নাই। সরকারী তহবিলের ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার সর্ব্ববিধ সুবিধা ইহা ভোগ করিতেছিল ; কিন্তু বে-সরকারী ইংরেজ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায় ইহা হইতে ভারতবাসীরা যথোচিত সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতে ছিল না। বিলাতী কোন ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের উচ্চ পদ লাভ করা দূরের কথা, শিক্ষানবিশীরূপে প্রবেশ লাভ করা পর্য্যন্ত দুরূহ। সরকারী অর্থে পুষ্ট ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিশী কাজে ভারতবাসীকে নেওয়া হইবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণের এই সম্পর্কে কোনরূপ উৎসাহ দেখা যায় নাই। বিদেশী ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে যেরূপ, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের বেলায়ও তেমনি—ইংরেজ ব্যবসায়ী ও বণিকগণ এই ব্যাঙ্কে যেরূপ সহজে অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হয়, দেশীয় লোকের পক্ষে যোগ্যতা থাকিলেও উহা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন নহে। ব্যাঙ্কের অধিকাংশ ম্যানেজার বা কর্ম্মাধ্যক্ষই ইংরেজ। মফঃস্বলের দেশীয় বণিক বা মহাজনদের সহিত ইহারা সাধারণতঃ মেলামেশা করেন না। তাহাদের অবস্থা, তাহাদের অভাব অভিযোগ ইঁহাদের জানিবার আগ্রহও নাই, সুযোগও হয় না। মফঃস্বলের শাখা আফিসে আমানত

বাবদ যে টাকা পাওয়া যায়, তাহার সামান্য অংশই স্থানীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতে পারে। অধিকাংশ আমানতী টাকাই প্রাদেশিক প্রধান কার্য্যালয়ে প্রেরিত হয়। সরকারী অর্থে ও সরকারী সাহায্যে ব্যাঙ্ক যে প্রচুর লাভ করিয়া থাকে, তাহার ষোল আনাই ব্যাঙ্ক লইয়া থাকে, ইহাও মোটেই ন্যায়সঙ্গত নহে। এই লাভের একটা অংশ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হওয়া উচিৎ ছিল। অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জাতীয় কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক দ্বারা সেই উদ্দেশ্য কোন অংশে সাধিত হয় নাই। বরঞ্চ মফঃস্বলে ইহাদের বহু শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে ইহাদের সহিত এক অসম ও অনভিপ্রেত প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছিল। ভারতীয়দের স্বার্থের প্রতি ঔদাসীন্য, উচ্চ লাভের দিকে খরদৃষ্টি—অথচ ভারতসরকার ও ভারতবাসীর অর্থ দ্বারাই ইহার পুষ্টি—এই অবস্থার বৈসাদৃশ্য ভারতীয় জনমতকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আর একটি বড় অভিযোগ এই ছিল যে, নোট প্রচলন ও তৎসহ মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের ভার য়ুরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় ইহার হাতে দেওয়া হয় নাই। স্বর্ণমান তহবিল (Gold Standard Reserve) ও বিলাতের দক্ষিণা (Home Charges) বাবদ ইংলণ্ডকে আমাদের যে টাকা দিতে হয়, সেই টাকা পাঠাইবার ভারও ইহার উপর ন্যস্ত হয় নাই। এই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ত্তব্য, দেশের ভিতর প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের সুনিয়ন্ত্রণ, ইহার পক্ষে মোটেই সম্ভব হয় নাই। একদিকে গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল নোট প্রচলনের ক্ষমতা, নোট ও স্বর্ণমান তহবিল এবং বিলাতের দক্ষিণার টাকা পাঠাইবার অধিকার ; অন্যদিকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের হাতে ছিল

ধার বা ক্রেডিট সৃষ্টির ক্ষমতা। ভারতের টাকার বাজারে এই দ্বিবিধ শক্তি কাজ করিতেছিল। ফলে পণ্যমূল্য স্থির রাখিবার জন্য প্রয়োজন মত অর্থ সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হইতেছিল না এবং আর্থিক ব্যবস্থা একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া দেশের কল্যাণার্থ পরিচালিত হইতে পারিতেছিল না। শুধু তাহাই নহে, ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতি বৎসর যে ছয় শত কোটি টাকার আদান-প্রদান হইয়া থাকে, তাহার প্রায় চৌদ্দ আনা কাজই য়ুরোপীয়েরা করিয়া থাকে। এই বিরাট বহির্বাণিজ্য হইতে কমিশন, দালালি, বীমা ফিস্ ইত্যাদি বাবদ যে প্রভূত অর্থ লাভ হয় তাহার অধিকাংশও ইহারাই পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, য়ুরোপীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Bank) হইতে বিদেশী ব্যবসায়িগণ যে আর্থিক সাহায্য ও সুপারিশ লাভ করিয়া থাকে, দেশীয় বণিকগণের ভাগ্যে তাহা লাভ করা সুদূরপরাহত। এই সব বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্ক ও তাহাদের বিদেশী গ্রাহকগণই ভারতের বহির্বাণিজ্যে একাধিপত্য করিতেছে। বিদেশী মুদ্রা কেনাবেচা সম্বন্ধে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের উপর নিষেধ থাকায় ইহাদের পক্ষে এই ক্ষেত্রে একাধিপত্য করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইয়াছে। ইহা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে, য়ুরোপীয় ব্যাঙ্কগুলিকে অসুবিধায় না ফেলিবার জন্যই বিদেশের সহিত অর্থের লেনদেন, ভারতের বাহিরে আমানত সংগ্রহ, বিনা জামিনে বিদেশ হইতে অর্থ ধার করা, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অন্যান্য বৈদেশিক ব্যাঙ্ক আমাদের দেশে নিরাপত্তিতে আমানত সংগ্রহ এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যই করিতে পারিবে; অথচ গবর্ণমেণ্ট-পৃষ্ঠপোষিত ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক ভারতের বাহির হইতে টাকা আমানত বা ধার গ্রহণ করিতে পারিবে না, ইহার অন্য কোনরূপ যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায়

না। অন্যান্য দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে 'ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক' বলা হয়। অর্থাৎ এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য সকল ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলের একটা অংশ গচ্ছিত রাখে এবং তাহাদের উপর অনেকটা মুরুব্বির ন্যায় অবস্থান করে। এইরূপে উহাদের কার্য্যকলাপের উপর ইহা যথেষ্ট পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। যদিও ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের নিকট অনেক ব্যাঙ্কের সঞ্চিত তহবিল গচ্ছিত থাকিত, কিন্তু তাহার পরিমাণ মোটেই বেশী ছিল না এবং তজ্জন্য আইনসঙ্গত কোনরূপ বাধ্য বাধকতাও ছিল না। এই সব নানা কারণে এই দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ও টাকার বাজারে পারস্পরিক সম্বন্ধবিশিষ্ট একটা কেন্দ্রীয় শক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত শক্তি পরস্পর স্বাধীন ভাবে কাজ করার ফলে, এই কঠিন প্রতিযোগিতার দিনে আমাদিগকে পদে পদে আর্থিক বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া'

সেইজন্যই খাঁটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জনসাধারণের তরফ হইতে সমভাবেই চলিতে থাকে এবং গবর্ণমেণ্টও ভারতের দাবীর ন্যায়পরতা ও যুক্তিবত্তা উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ১৯৩৫ সালে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের দীর্ঘ দিনের দাবী পূরণ করিয়াছেন। এই নূতন ব্যাঙ্কের গঠন প্রণালী ও কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে দেশীয় বিশেষজ্ঞগণের কোন কোন বিষয়ে আপত্তি থাকিলেও ইহা যে জাতীয় ব্যাঙ্কের সূত্রপাত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে সম্ভবতঃ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইহাকে অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় 'ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক' বলা যাইতে পারে। অন্ততঃ সেই উদ্দেশ্য সাধন করা ইহার অন্যতম মূল নীতি। ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই ব্যাঙ্ক মুদ্রা-

নীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক অর্থের বিনিময়, ও ভারত গবর্ণমেণ্টকে যে অর্থ ষ্টার্লিঙে দিতে হয় তাহা পাঠাইবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। স্বর্ণমান তহবিল (Gold Standard Raserve)ও নোট তহবিল (Paper Currency Reserve) ঐ সময় হইতে একত্র করিয়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের নোট এই ব্যাঙ্ক এখন ব্যবহার করিতেছে ; কিন্তু যথা সময়ে এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব নোট এই সব পুরাতন নোটের স্থান অধিকার করিবে। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে তপশীল-ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ক্যাশ তহবিলের নির্দ্দিষ্ট অংশ এই ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার পর ইহা মাতব্বর ব্যাঙ্ক হিসাবে দেশের দাদন বা ঋণ নিয়ন্ত্রণের (Credit Regulation এর) ভার গ্রহণ করিয়াছে। এবং ঐ বৎসর ৪ঠা জুলাই হইতে ইহা 'ব্যাঙ্ক রেট' ঘোষণা করিতে সুরু করিয়াছে। এক্ষণে এই ব্যাঙ্ক তাহার প্রভূত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের অর্থাভাব অনেকটা দূর করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য কার্য্য ক্ষেত্রে দেশবাসীর আশা আকাঙ্খার প্রতি উদার সহানুভূতিসম্পন্ন সুপরিচালনার উপর উহা প্রধানতঃ নির্ভর করিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাঠামো

এখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার গঠন-কাঠামো ও ইহার প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক। এই ব্যাঙ্কের প্রস্তাবনার সূচনায় প্রথম মতভেদ উপস্থিত হয়, ইহা সরকারী মূলধনে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক (State Bank) হইবে, কি, সর্ব্বসাধারণের মূলধনে যৌথ ব্যাঙ্ক (Shareholders' Bank) হইবে।

অষ্ট্রেলিয়া, লাটভিয়া, ইস্থোনিয়া প্রভৃতি কয়টি অপ্রধান দেশের কথা বাদ দিলে অন্য কোন বিশিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক নহে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, রাজনৈতিক দলাদলির উর্দ্ধে থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় সমস্যার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে না পড়িয়া নিরপেক্ষ ভাবে শান্ত আবহাওয়ার ভিতরে দেশের আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ (Currency and Credit Regulation) ইহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মতান্তর যেরূপ প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে রাষ্ট্রের পুরাপুরি কর্ত্তৃত্ব পদে পদে সন্দেহ ও প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে সরকারী আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত যৌথ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করা হইয়া থাকে যে, কালক্রমে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কের প্রকৃত মালিক হইয়া দাঁড়াইবে এবং ইঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ অপেক্ষা বড় হইয়া পড়িবে। এই সম্পর্কে আমরা বিখ্যাত জার্ম্মান মনীষী স্মোলারের (Schmoller-এর) মত উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন, "A great Central Bank performs its functions best when it possesses a certain independence as against the State. But all such independence is lost if the Central Bank is a State Bank and works with state capital. It becomes in that case an easy prey to fiscal forces and tendencies, and serves only the state finance, not the national economy. If, on the other hand, it is a purely shareholders' bank, it will be guided in her economic policy by her Directors who are big shareholders themselves. It is then entirely in the hands of capitalism and tries to earn large dividends which is not consistent with service to the country." এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া, ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া প্রস্তাবটি অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে সর্ব্বসাধারণের অর্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। অবশ্য যৌথ ব্যাঙ্কের উল্লিখিত কুফল নিবারণের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়াই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই ব্যাঙ্কের নির্দ্ধারিত ও বিলিকৃত মূলধন পাঁচ কোটি টাকা। ইহা নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভাগে নিম্নোক্তরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; কলিকাতা- ১৪৫ লক্ষ; বোম্বাই- ১৪০ লক্ষ; দিল্লি-১১৫ লক্ষ; মাদ্রাজ- ৭০ লক্ষ; রেঙ্গুন- ৩০ লক্ষ। কতিপয় ধনীর হাতে যাহাতে সমস্ত শেয়ার জড় হইতে না পারে তজ্জন্য (প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা মূল্যের) পাঁচটির অধিক শেয়ার কোন প্রার্থীকেই প্রথমতঃ বিলি করা হয় নাই। এই ভাবে বণ্টনের পর কোন বিভাগে অংশ অবিক্রীত থাকিলে পাঁচটির অধিক অংশের দাবী পূরণ করা হইয়াছে। অন্য দেশে তাহাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অংশ বিদেশীকে ক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার বৃটিশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগকে— যাহারা ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছেন (Ordinarily resident in India)—কিনিতে দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। উপরিউল্লিখিত পাঁচটি বিভাগের জন্য পাঁচটি লোক্যাল বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটির জন্য আট জন সদস্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক এলাকার অংশীদারগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে ভোট দ্বারা পাঁচ জনকে নির্ব্বাচিত

করিবেন। অবশিষ্ট তিন জনকে সেণ্ট্রাল বোর্ড (যাহা পাঁচটি লোক্যাল বোর্ডের উপরে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিবে) তাহাদের নিজ নিজ বিভাগের অংশীদারগণের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। এইরূপ মনোনয়ন কৃষি বা সমবায় সমিতির স্বার্থ কিম্বা অন্য যে সব আর্থিক স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন নাই এইরূপ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। নির্ব্বাচনের সময় প্রত্যেক পাঁচটি অংশে একটি করিয়া ভোট দিতে পারা যাইবে এবং কোন অংশীদারই—তাহার অংশের পরিমাণ যত বেশীই হউক না কেন—দশটির বেশী ভোট দিতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব যাহাতে কতিপয় ক্ষমতাপন্ন ধনী ব্যক্তির হাতে যাইয়া না পড়ে তজ্জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিক লাভের লোভে জাতীয় স্বার্থ যাহাতে বিসর্জ্জিত না হয় এবং কতিপয় ধনী যে কোন মূল্যে অংশ ক্রয় করিয়া ইহার মালিক হইয়া বসিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ অবস্থায় শতকরা ৫৲ টাকার বেশী লভ্যাংশ বিতরিত হইবে না, ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল বোর্ড বা কেন্দ্রীয় সমিতি নিম্নলিখিত ভাবে সংগঠিত হইয়াছে—

১। একজন গবর্ণর ও দুইজন ডেপুটী গবর্ণর। ইঁহাদিগকে সপারিষদ বড়লাট মনোনীত করিবেন। এই মনোনয়ন ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সমিতির সুপারিশ যথাসাধ্য বিবেচনা করিবেন।

২। চারি জন পরিচালক (Directors)—ইঁহাদিগকেও সপারিষদ বড়লাট মনোনয়ন করিবেন।

৩। আট জন পরিচালক (Directors) —তন্মধ্যে কলিকাতা বোম্বাই ও দিল্লী লোক্যাল বোর্ড প্রত্যেকে দুইজন (মোট ছয় জন),

এবং মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন লোক্যাল বোর্ড প্রত্যেকে একজন, এই ভাবে সর্ব্বমোট আটজন, তাঁহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিবেন।

৪। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী—ইঁহাকে সপারিষদ বড়লাট মনোনীত করিবেন।

গবর্ণর এবং দুইজন ডেপুটী গবর্ণর ব্যাঙ্কের বেতনভোগী কর্ম্মচারী হিসাবে কাজ করিবেন এবং তাঁহাদের সকল সময় ব্যাঙ্কের কাজেই নিয়োগ করিতে হইবে। সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য লোক্যাল ও সেণ্ট্রাল বোর্ডের সভ্যগণ এবং গবর্ণর ও ডেপুটী গবর্ণর নির্ব্বাচিত ও মনোনীত হইবেন। ব্যাঙ্ক পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব সেণ্ট্রাল বোর্ডের উপরেই থাকিবে। লোক্যাল বোর্ড সেণ্ট্রাল বোর্ডের নির্দ্ধারিত বা বরাতী কাজ মাত্র করিতে পারিবেন। স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে সেণ্ট্রাল বোর্ড তৎসম্বন্ধে লোক্যাল বোর্ডের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

রাজনৈতিক প্রভাব হইতে ব্যাঙ্ককে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রাদেশিক কিম্বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে ব্যাঙ্কের লোক্যাল ও সেণ্ট্রাল পরিচালক সঙ্ঘ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক সময়ে একদল লোক ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং ১৯২৭—২৮ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ গৃহে এই বিলটির অপমৃত্যুর ইহাও অন্যতম কারণ।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, সেণ্ট্রাল বোর্ডের ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন সদস্য সপারিষদ বড় লাট কর্ত্তৃক মনোনীত এবং বাকী ৮ জন সদস্য অংশীদারগণ কর্ত্তৃক লোক্যাল বোর্ড মারফতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ডেপুটী গবর্ণর দুই জন ও সরকারী

কর্ম্মচারীটি বোর্ডের আলোচনায় ও বিতর্কে যোগদান করিতে পারিলেও ভোট দিতে অধিকারী নহেন। তবে গবর্ণর সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত একজন ডেপুটী গবর্ণর মাত্র ভোট দিতে পারিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অংশীদার-নির্ব্বাচিত এবং বড়লাট-মনোনীত সদস্য-সংখ্যা সমান সমান হইলেও, মোটের উপর সেণ্ট্রাল বোর্ডে নির্ব্বাচিত বে-সরকারী প্রতিনিধিগণের ভোটাধিক্য বজায় রাখা হইয়াছে—লোক্যাল বোর্ডেত সরকারী মনোনয়নের কোন ব্যবস্থাই নাই। শুধু তাহাই নহে, এক দিকে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সকল সদস্যের পক্ষে ব্যাঙ্কের লোক্যাল ও সেণ্ট্রাল বোর্ডের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া যেমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, অন্যদিকে সরকারী আমলাগণের বেলাও অনুরূপ নিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মোটের উপর, এই ব্যাঙ্ককে সরকারী, বে-সরকারী শ্রেণী বিশেষের অসঙ্গত প্রতিপত্তি ও প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সপারিষদ বড় লাটের অভিভাবকত্বে অংশীদারগণের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যতটুকু স্বায়ত্তশাসন এই ক্ষেত্রে আমরা লাভ করিয়াছি, দলাদলি না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহারের উপর আমাদের ব্যাঙ্কিঙের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিবে।

ভারতে বে-সরকারী যৌথ ব্যাঙ্কের জন্ম ইতিহাস

এক্ষণে ভারতীয় যৌথ-ব্যাঙ্ক ও বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম করা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তী কালে ইহাদের স্থলে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার বেলাও ঐ

নিষেধই বলবৎ ছিল। লণ্ডনে বা বিদেশে অন্যত্র কোন শাখা না থাকায় দেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলির পক্ষেও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের মধ্যে ইণ্ডিয়ান স্পেশি ব্যাঙ্কই সর্ব্বপ্রথম লণ্ডনে একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করে। শিমলার এলায়েন্স ব্যাঙ্কও তৎপর বিলাতে তাহাদের আফিস খোলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ ব্যাঙ্ক ১৯২৩ সালে দেউলিয়া হইয়া যায়। টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল ব্যাঙ্কেরও লণ্ডনে শাখা আফিস ছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে উহা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার সহিত সংযুক্ত হইবার পর ঐ শাখা আফিস বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি মহা আড়ম্বরে লণ্ডন সহরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। য়ুরোপে বা বিদেশে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের ইহাই একমাত্র শাখা। ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তা করিবার উপযোগী ব্যবস্থা ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক না হওয়ায় বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি ভারতে শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রধানতঃ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করে। পরে অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ও য়ুরোপের অন্যান্য ব্যাঙ্কও এদেশে তাহাদের শাখা স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যাঙ্কের কাজ প্রধানতঃ এই দেশে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ন্যাশনেল্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, পেনিন্সুলার এণ্ড ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর কতকগুলি ব্যাঙ্কের শাখা ও কাজকর্ম্ম সমগ্র এশিয়ার প্রায় বড় বড় নগরেই রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে লয়েড স্ ব্যাঙ্ক, হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, উকোহামা স্পেশি ব্যাঙ্ক,

ন্যাশনেল সিটি ব্যাঙ্ক অব্ নিউ ইয়র্ক, আমেরিকান্ এক্স্প্রেস কোম্পানী, ব্যাঙ্ক অব্ টিওয়ান, ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক অব্ পার্শিয়া, ইণ্টারন্যাশনেল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ব্যাঙ্কো ন্যাশনেইল আলট্রা মেরিনো, টমাস কুক্ এণ্ড সন্ (ব্যাঙ্কার্স) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৮১ সালে অযোধ্যা কমার্শিয়্যাল ব্যাঙ্ক, ১৮৯৪ সালে পাঞ্জাব ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক ও ১৯০১ সালে পিপল্স্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া (লাহোরে) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর ১৯০৬ সালের পর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে সারা ভারতবর্ষে যখন নূতন স্বদেশী যুগের বন্যা উপস্থিত হয়, তখন তাহার উদ্দীপনায় ১৯১০—১১ সালের মধ্যে ছোট বড় ৪৭৬টি যৌথ ব্যাঙ্কের উদ্ভব হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে; যথা, ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান্ স্পেশি ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক, ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অব্ মান্দ্রাজ, বোম্বে মার্চ্চেণ্টস্ ব্যাঙ্ক, ক্রেডিট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, কাথিওয়ার এণ্ড আমেদাবাদ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন্ ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। উপরিউল্লিখিত ১১টি বড় বড় ব্যাঙ্ক মধ্যে ১৯১৩-১৪ সালে ছয়টি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়। সেই সময়ে ছোট বড় মোট দেউলিয়া ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৩টি। ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত উহাদের সংখ্যা ১৬১টিতে পৌঁছে। ইহাদের মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রায় সাত কোটি টাকা। লালা হরকিষণ লাল প্রতিষ্ঠিত পিপল্স্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া (দেউলিয়া ১৯১৩ খৃঃ) এবং বোল্টন্ ব্রাদার্স পরিচালিত এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্ সিম্‌লা (দেউলিয়া ১৯২৩ খৃঃ) এই দুইটি বিখ্যাত ব্যাঙ্কও ইহাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই সম্পর্কে একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিরাট পিপল্স্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

তাহার ১০০ শাখা আফিস সহ যখন দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয় তখন কোম্পানীর কাগজ বন্ধক রাখিয়াও বিদেশী কিম্বা সরকারী ব্যাঙ্ক হইতে ইহা টাকা ধার পায় নাই। বরঞ্চ কথিত আছে, উহার দরজা বন্ধ হইলে অনেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ মনের আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া ভোজসভার আয়োজন করিয়াছিলেন।* কিন্তু বোল্টন ভ্রাতাদের অসাধু আচরণে এলায়েন্স ব্যাঙ্কের পতন হইলে (বিদেশী) আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থ ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ককে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছিল।

দেশী ও বিদেশী ব্যাঙ্কের অবস্থার তুলনা

যাহাদের মূলধন ও মজুত তহবিল (Reserve) এক লক্ষ টাকার ন্যূন নহে এইরূপ ৭৮টি ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের হিসাব এক্ষণে আমরা এখানে দিতেছি :

ব্যাঙ্কের সংখ্যা	মূলধন	মজুত তহবিল	আমানত	নগদ তহবিল
৭৮	৮৬২ লক্ষ	৪০৭ লক্ষ	৬,৬৩০ লক্ষ	৯,৫০ লক্ষ

অপরদিকে ভারতবর্ষে যে ১৮টি বিদেশী ব্যাঙ্ক আছে তাহাদের কেবল ভারতীয় আমানতের পরিমাণই ৬৮,১১ লক্ষ টাকা!

আমরা এখানে কয়েকটি বিদেশী ব্যাঙ্কের নিজস্ব মূলধন ও আমানতের হিসাবও দিতেছি। ইহা হইতে আমাদের ৭৮টি বৃহৎ ব্যাঙ্কের সম্মিলিত মূলধন ও আমানত অপেক্ষা ইহাদের প্রত্যেকটির মূলধন ও আমানত কি পরিমাণ বেশী তাহা দেখা যাইবে এবং আমরা কোথায় আছি বুঝিতে পারা যাইবে।

---

* ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে কমিশনের অন্যতম সদস্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের প্রশ্নোত্তরে জনৈক ইংরাজ ইহা স্বীকার করেন।

		আদায়ী মূলধন	মজুত-তহবিল	আমানত
১।	লয়েড্‌স্‌ ব্যাঙ্ক (ইংলণ্ড)	২১ কোটি টাকা	অজ্ঞাত	৪৬৫ কোটি
২।	ন্যাশনেল সিটি ব্যাঙ্ক অব্‌ নিউ ইয়র্ক (আমেরিকা)	৩৫ কোটি ”	”	২৮২ কোটি
৩।	য়ুকোহামা স্পেশি ব্যাঙ্ক (জাপান)	১৫ কোটি ”	১৯ কোটি	৮৫ কোটি
৪।	হংকং এণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	১½ কোটি	৯½ কোটি	৭০ কোটি

নিম্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে ভারতের ও ভারতীয় ব্যাঙ্কিঙের অবস্থা আরো স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

	দেশ	(১) ব্যাঙ্কিং আফিসের সংখ্যা	(২) প্রত্যেক দশলক্ষ লোকের জন্য আফিসের সংখ্যা	(৩) প্রত্যেক ২১০০ বর্গ মাইলে আফিসের সংখ্যা	(৪) মাথা পিছু আমানত
(১)	ইংলণ্ড-স্কটলণ্ড-ওয়েল্‌স্‌	১১,৯৭৬	২৮৫	৩৬২	৮০০৲
(২)	যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা)	৩০,০০০	২৫৬	২০	১১৬০৲
(৩)	জাপান	৭,৪৬৫	৯২	৮০	১০৬৲
(৪)	কেনাডা	৪,৮৮০	৫৪৮	৩	৬৬৭৲
(৫)	ভারতবর্ষ	৫৯৬*	২	১	৪৲

* ১৯২৮ সালে ভারতবর্ষের মোট ২৩০০ সহরের ভিতরে মাত্র ৩৩৯টিতে কোন ব্যাঙ্ক বা তাহার শাখা বা এজেন্সী ছিল।

ইহার উপর মন্তব্য অনাবশ্যক। বাংলার অবস্থা আরও কাহিল। যে সব ব্যাঙ্কের মূলধন ও মজুত তহবিল একত্রে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা সেই সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্করূপে গণ্য হইবার অধিকারী। বিদেশী ব্যাঙ্ক সহ ৫৮টি ব্যাঙ্ক আজ পর্য্যন্ত এই মর্য্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান-যথা, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন। এই তিনটি ব্যাঙ্কের সম্মিলিত মূলধন ও মজুত তহবিল (আনুমানিক) ১৬ লক্ষ টাকা মাত্র! অর্থাৎ কোন প্রকারে ন্যূনতম যোগ্যতার দাবী ইহারা পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে বিদেশীর স্থান

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় অনেক প্রয়োজনীয় আলোচনা হইতে আমাকে বিরত থাকিতে হইতেছে। কিন্তু এখানে একটি কথা নিতান্তই না বলিলে নয়। অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিদেশী ব্যাঙ্ককে আপনার তপশীলভুক্ত হিসাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু এদেশে শুধু বিলাতী ব্যাঙ্ক নহে, সর্ব্বদেশীয় ব্যাঙ্ককেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বাজাত্যের মর্য্যাদা ও বাৎসল্যের আনুকূল্য দানে অনুগৃহীত করিয়াছে। ইহাতে একদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিদেশী ব্যাঙ্কের জবাবদিহি করিবার নূতন দায়িত্ব যেমন খানিকটা উদ্ভব হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা লাভের সুযোগও তাহারা দেশীয় ব্যাঙ্কের সহিত সমভাবে লাভ করিয়াছে। এই সব অতিকায় বিদেশীয় ব্যাঙ্কের সহিত তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্কগুলির আকার ও পসার নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ। সুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনেকটা দৈত্য-বামনের লড়াইয়ের মত। পূর্ব্বে এই সব বিদেশী ব্যাঙ্ক বৈদেশিক

বাণিজ্যের কাজকর্ম্মই প্রায় ষোল আনা করিত। কিন্তু এক্ষণে তাহারা ভারতের বিভিন্ন নগরে শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা করিয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কিঙের কাজকর্ম্ম করিতে সুরু করিয়াছে। ইহার ফলে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পসার প্রতিপত্তি লাভ করা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই ভারতীয় অর্থে পুষ্ট, অথচ ভারতীয় স্বার্থে উদাসীন ও বিরূপ এই সব ব্যাঙ্কের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তরফ হইতে অধিকতর কর্ত্তৃত্ব ও ক্ষমতা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। যাহা হউক, যাহা হয় নাই তৎসম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় আমাদের ব্যাঙ্কিঙের কি ভাবে উন্নতি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিতেছি।

আমাদের আশু কর্ত্তব্য

আমাদের দেশে অসংখ্য ছোট ছোট যৌথ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। বিশেষতঃ বাংলা দেশে ব্যাঙের ছাতার মত ইহাদের উৎপত্তি হইতেছে। ইহাতে প্রতিযোগিতা অসঙ্গতরূপে বাড়িয়াছে এবং কাহারও পক্ষে উন্নতি লাভ করা সহজসাধ্য হইতেছে না। এই সব ব্যাঙ্ক যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা যেমন অপ্রচুর, প্রভাব প্রতিপত্তিও তেমনি সামান্য। এই অবস্থা মোটেই স্বাস্থ্যকর নহে। আমাদের কর্ত্তব্য এই সব অসংখ্য ছোট ব্যাঙ্কের সমন্বয় সাধন করিয়া কতকগুলি শক্তিশালী ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা,— যাহারা ভারতের অন্তর ও বহির্বাণিজ্যে তাহাদের ন্যায্য স্থান অধিকার করিতে পারিবে। ইংলণ্ডের Big Five নামে বিশ্ববিশ্রুত পাঁচটি ব্যাঙ্ক আজ সমস্ত দুনিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হইয়াছে, যে সব প্রাইভেট ব্যাঙ্কার, মহাজন ও সাহুকার আছে তাহাদিগকে আধুনিক রীতিনীতি অনুযায়ী ব্যাঙ্কিঙের কাজে নিয়োজিত করা এবং ইহারা যোগ্যতা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত পূরণ করিতে পারিলে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক হিসাবে ইহাদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আওতায় গ্রহণ করা। তাহা হইলে সহরের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি মফঃস্বলের চেক ও হুণ্ডির টাকা ইহাদের সাহায্যে সহজেই আদায় করিতে পারিবে। এবং এই কার্য্যের বিনিময়ে ইহারাও অন্যান্য ব্যাঙ্কের ন্যায় স্বল্প খরচে টাকা পাঠাইবার অধিকার লাভ করিতে পারিবে।

তারপর ইহাদিগকে নিখিল ভারতীয় ব্যাঙ্কার্স সমিতির সভ্য করিয়া লইতে হইবে এবং যাহারা তপশীলভুক্ত হইতে পারিবে না তাহাদিগকে সহকারী সদস্য (Associate Members) রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ফলে দেশীয় প্রাইভেট ব্যাঙ্কগুলির মর্য্যাদাই শুধু বাড়িবে না, উহাদের কর্ম্ম-পদ্ধতিরও উন্নতি সাধিত হইবে এবং ভারতের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে একটা সুপরিচালিত সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি গড়িয়া উঠিবে—যাহার আবশ্যকতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পরিভাষা

Acceptance of bills	হুণ্ডি গ্রহণ, হুণ্ডি স্বীকার
accommodation bill	উপযোজক হুণ্ডি
account book	হিসাব বহি
account of profit & loss	মুনাফা বহি, লাভ লোকসানের হিসাব
acquittance	ফারখতি
address book	ঠিকানা বহি
administration	শাসন, পরিচালন
advalorem duty	মূল্যানুযায়ী শুল্ক
advance	দাদন, বায়না, অগ্রিম
after sight	ম্যাদ অন্তে, মুদ্দতবাদে
agency	আড়ৎদারী
agreement	চুক্তি (পত্র), একরার (নামা)
allotment	বিলিকরণ
allowance	ভাতা
alternative standard	বিকল্পমান
anarchism	বিপ্লববাদ, অরাজকতা
annuity	(বার্ষিক) বৃত্তি
appraiser	যাচনদার
appreciation	মূল্যবৃদ্ধি, উপচয়
apprentice	শিক্ষানবীশ
approximate	সন্নিহিত, কাছাকাছি, কিছু কমবেশী

arbitration	সালিশী, মধ্যস্থতা
aristocracy	অভিজাত সম্প্রদায়, অভিজাততন্ত্র
arrears	বকেয়া, বাকী
artisan	শিল্পজীবী, কারিকর
assay	যাচাই
assembly	সংসদ, পরিষদ, সভা
assessment	কর নির্দ্ধারণ
assets	সম্পত্তি, পাওনা
assort	বাছাই করা
attachment	ক্রোক
attorney	মোক্তার, এটর্ণী
attorney, power of	আমমোক্তারনামা
audit	হিসাব পরীক্ষা
auxiliary capital	সহায়ক মূলধন
average price	গড়পরতা মূল্য

Balance	উদ্বৃত্ত
balance sheet	উদ্বর্ত্ত পত্র
balance of trade	বাণিজ্যিক গতি বা ফলাফল, আমদানি রপ্তানির জের
bank rate	ব্যাঙ্কের হার
bank reference	ব্যাঙ্কের সুপারিশ
bankruptcy	দেউলিয়া
barter	দ্রব্য বিনিময়, বদলাই

bear	নিম্নগ
base coin	হীন মুদ্রা
bill book	বিল বহি
bill of exchange	ব্যবসায়ী হুণ্ডি
bill accommodation	উপযোজক হুণ্ডি
bill documentary	দলিলী হুণ্ডি
bill of entry	কাষ্টম আফিসে দাখিলী পণ্যদ্রব্যের লিষ্ট
bill of lading	(রেল বা জাহাজের) চালানী রসিদ
bill of right	অধিকার পত্র
bill of sale	কবালা
bill on demand	দর্শনী হুণ্ডি
bill on sight (payable after date)	মিতি বা মুদ্দতী হুণ্ডি
bill, treasury	সরকারী হুণ্ডি
bimetalism	দ্বিধাতবমান
blockade	অবরোধ
bond (mortgage)	রেহেনী খত
bond (simple)	সাদা খত
bonded goods	শুল্কবাকী আমদানী মাল
boom	বাজার গরম
bounty	সরকারী সাহায্য, দানশুল্ক
bourgeois	পরশ্রমজীবী, ধনিকসম্প্রদায়
broker, ordinary	সাধারণ দালাল
broker, produce	সর্ব্বপ্রকার মালের দালাল
broker, sole	বাঁধী দালাল

budget	আয়-ব্যয় বরাদ্দ
bull	ঊর্দ্ধগ
bullion	ধাতুথান বা ধাতুখণ্ড
bureaucracy	আমলাতন্ত্র
business	কারবার, ব্যবসা
bye-product	উপজাত দ্রব্য, গৌণপণ্য
cabinet	মন্ত্রিমণ্ডলী
capital, authorised	মঞ্জুরীকৃত মূলধন নির্দ্ধারিত মূলধন
capital, auxiliary	সহায়ক মূলধন
capital, called	তলবী মূলধন
capital, circulating	চলতি মূলধন
capital, fixed	স্থির মূলধন
capital goods	মূল বস্তু
capital, paid up	আদায়ী মূলধন
capitalism	ধনতন্ত্র
capitalist	মূলধনী, মহাজন
capital, issued	বিলিকৃত মূলধন
capital, subscribed	বিক্রীত মূলধন
cartel	মূল্যনিয়ন্ত্রণ সঙ্ঘ
cash	নগদ টাকা
cash book	রোকড়, নগদান খাতা
caste system	বর্ণাশ্রম প্রথা
census	আদমসুমারী
central bank	কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

charter	সনদ
cheque	চেক
circulating medium	প্রচলিত বাহন
civic	পৌর
civil court	দেওয়ানী আদালত
civil war	অন্তর্বিপ্লব
clearing house	চেকবিনিময় গৃহ
client	মক্কেল
coin (base or token)	হীনমুদ্রা, অন্ত্যজ মুদ্রা
collective security	সম্মিলিত নিরাপত্তা
collectivism	সমূহতন্ত্র
colony	উপনিবেশ
combination	সমবায়, জোট
combination, horizontal	সমশিল্প সমবায়
combination, vertical	ভিন্নশিল্প সমবায়
comforts	সুখকর বস্তু
commercial	বাণিজ্যিক
commission	দস্তুরী, দালালী
commodity	পণ্য
common wealth	সাধারণতন্ত্র
communism	সাম্যবাদ
company	কোম্পানী, যৌথকারবার
complimentary	অনুপূরক
compound rate	চক্রবৃদ্ধিহার

compromise	রফা, নিষ্পত্তি
concession	রেয়াৎ, অনুগ্রহ
confederation	সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্র সম্মেলন
confiscate	বাজেয়াপ্ত করা
conservative	রক্ষণশীল
consignment	চালান
consignee	প্রাপক
consumption	ভোগ, ব্যবহার, কাটতি
consolidated fund	থোকপুঁজি
constitution	গঠন, কাঠামো
consul	রাষ্ট্রদূত
consumer	ভোগী, খাদক, খরিদ্দার
consumer's capital	ভোগ্যবস্তু
cousumer's surplus	ভোগোদ্বৃত্ত
contingency	দুর্ঘটনা
contract	চুক্তি, ঠিকা, ইজারা, একরার
conventional	ব্যবহারমূলক, প্রথানুযায়ী
conversion (of debt)	রূপান্তরীকরণ
convertible (paper money)	পরিবর্ত্তনীয় (কাগজী মুদ্রা)
co-operation	সমবায়, যৌথ, সহযোগ
copy book	নকল বহি
corporation	সঙ্ঘ
corner	একচেটিয়া
corvee	বেগার

cost	খরচ, ব্যয়
cost, comparative	আপেক্ষিক ব্যয়
cost, constant	স্থির-, অবিচল-, সম-, ব্যয়
cost, establishment	সরঞ্জামী খরচ
cost of production	উৎপাদন-শ্রম, উৎপাদন-ব্যয়
countervailing	সমকারী
covenant	চুক্তি
credit account	জমার হিসাব
credit balance	উদ্বৃত্ত তহবিল
creditor	উত্তমর্ণ, মহাজন
crisis	সঙ্কট
culture	কৃষ্টি, সংস্কৃতি
credit	বাজার সম্ভ্রম, ধার, দাদন, জমা
credit balance	উদ্বৃত্ত তহবিল
currency	মুদ্রা
currency notes	কাগজী মুদ্রা
currency, contraction of	মুদ্রাসঙ্কোচন
currency, deflation of	,,
,, expansion of	মুদ্রাসম্প্রসারণ
,, inflation of	,,
,, devaluaton of	মুদ্রামূল্যহ্রাস
customs	আমদানীশুল্ক
days of grace	অনুগ্রহ মেয়াদ
day book(journal)	খসরা বা জাবেদা খাতা

debenture	ঋণপত্র
debit	খরচ
debit balance	ঘাটতী তহবিল
debt, public	জনঋণ
debt, redemption of	ঋণমুক্তি
debt, repudiation of	ঋণ অস্বীকার
debtor	অধমর্ণ, খাতক
deed of sale	কবালা
deferred (payment)	স্থগিত, বিলম্বিত (পরিশোধ)
deficit	ঘাটতী
deflation	সঙ্কোচন
demand	চাহিদা
demand, composite	মিশ্রচাহিদা
demand, continuous	অবিরাম চাহিদা
demand curve	চাহিদা রেখা
demand, derived	উদ্ভূত চাহিদা
demand, effective	কার্য্যকরী চাহিদা
demand, elastic	পরিবর্ত্তনশীল চাহিদা
demand, unelastic	অপরিবর্ত্তনশীল চাহিদা
demand loans	প্রার্থিত কর্জ্জ
demand price	চাহিদামূল্য
democracy	গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র
democracy, direct	প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র
democracy, representative	নির্ব্বাচিত গণতন্ত্র

demonetisation	মুদ্রাবিচ্যুতি
deposit, current	চলতী আমানত
deposit, fixed	মেয়াদী আমানত
depositor	আমানতকারী
depreciation	মূল্যহ্রাস, অবচয়
depression	মন্দা
despotism	স্বেচ্ছাতন্ত্র
devaluation	মূল্যহ্রাস
deviation	ব্যত্যয়, বিচ্যুতি
differentiation	বিভেদন
discount	বাটা, ব্যাজ
distribution	বণ্টন
dividend	লভ্যাংশ
division of labour	কর্ম্মবিভাগ
domicile	সমাবাস, স্থায়ি-বাসস্থল
double standard	দ্বিমান
draft	চেক, বরাতী হুণ্ডী
drawer	হুণ্ডী লেখক
drawee	দায়ক
dual policy	দ্বৈতনীতি
dumping	ক্ষতি দিয়া মাল চালান
duty	শুল্ক
Earnest money	বায়না
economic	আর্থিক, অর্থনৈতিক

economic rent	উপযৌগিক কর
economic backwardness	আর্থিক অনুন্নতি
economics	ধনবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র
efficiency	দক্ষতা
ejectment	উচ্ছেদ, উৎখাত
elastic	পরিবর্ত্তনশীল
elasticity	সঙ্কোচ-প্রসার
election	নির্ব্বাচন
election, Direct	প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন
election, Indirect	পরোক্ষ নির্ব্বাচন
elector	নির্ব্বাচক
electorate	নির্ব্বাচক মণ্ডলী
embargo	রোক, আটক, নিষেধাজ্ঞা
emergency	জরুরী
employment bureau	নিয়োগ সমিতি
endorse	দস্তখত
enfranchisement	নির্ব্বাচনাধিকার
enterprise	উদ্যোগ, প্রচেষ্টা
entrepreneur	উদ্যোক্তা, উদ্যোগী, নিষ্পাদক
environment	প্রতিবেশ, আবেষ্টন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা
equality of sacrifice	সমত্যাগ
equation	সমীকরণ
equilibrium	স্থিতিসাম্য
equilibrium price	স্থিরীকৃত মূল্য

equimarginal	সমসীমান্তক
equity	ন্যায়
eviction	বেদখলি, বহিষ্কার
exchange	পরিবর্ত্ত, বিনিময়
exchange, Dislocated	অনির্দ্দিষ্ট বিনিময়
exchange first of	পৈট
exchange, second of	পরপৈট
exchange ratio	বাট্টার হার
excise	আবগারী
executive	শাসনবিভাগীয়, ঐ বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ
expenses of production	উৎপাদন ব্যয়
exploitation	শোষণ
export	রপ্তানি
external trade	বহির্বাণিজ্য
Face value	আদিমূল্য, নির্দ্দিষ্ট মূল্য
factory	কারখানা
federal union	সংযুক্ত রাষ্ট্রমণ্ডলী
federation	সঙ্ঘ
feudalism	সামন্তচক্র, মনসবদারী
fiduciary	প্রচ্ছন্ন
fair cash	পাকা রোকড়
finished goods	তৈরীমাল, পাকামাল
firm's credit	কারবারের সুনাম বা সম্ভ্রম
fiscal	অর্থসম্বন্ধীয়, রাজস্বঘটিত

fixed account	স্থায়ী হিসাব, মেয়াদী হিসাব
fixed deposit	স্থায়ী আমানত, মেয়াদী আমানত
fixed price	নির্দ্দিষ্ট মূল্য
foreign trade	বহির্বাণিজ্য
free trade	অবাধ বাণিজ্য
fund	কোষ, ভাণ্ডার, তহবিল
Gambling	জুয়া
garbling	বিকৃতকরণ
general price level	পণ্য সাধারণের মূল্যস্তর
gold bullion standard	স্বর্ণখণ্ডমান
gold exchange standard	স্বর্ণবিনিময়মান
gold specie standard	স্বর্ণমুদ্রামান
gold standard	স্বর্ণমান
gold, mint price of	টাকশালের স্বর্ণহার
goods, Economic	উপযৌগিক ধন
goodwill	সুনাম, প্রতিষ্ঠা
governing body	অধিষ্ঠায়কবর্গ, শাসনপরিষদ, পরিচালক-সঙ্ঘ
government	সরকার, শাসন
government, Centralised	কেন্দ্রীভূত শাসন
government, Federal	যুক্তশাসন
government, Presidential	রাষ্ট্রনেতৃক শাসন
government promissory note	কোম্পানীর কাগজ, গভর্ণমেণ্টের দায়পত্র
government, Unitary	কেন্দ্রীভূত শাসন

gratuitous	অহেতুক, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত
gross	মোট
ground rent	ভূমিকর
guild	সম্প্রদায়,
guild socialism	শ্রেণীগত সমাজতন্ত্র
Handicraft	কারুকলা, হস্তশিল্প
hereditament	মৌরস, পৈত্রিক বিত্ত
heterogeneous	বিবিধজাতিক, বিসদৃশ, ভিন্নপ্রকার
holding	জোত
home charges	বিলাতের দক্ষিণা, বিলাতী দেনা
home trade	অন্তর্বাণিজ্য
homogeneous	সমজাতিক, এক জাতীয়
Immigration	দেশান্তরী
impact of a tax	করসংঘাত
imperialism	সাম্রাজ্যবাদ
imperial preference	সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত
import	আমদানি
impressed money	স্থায়ী জিম্মা তহবিল
income tax	আয়কর
income, money	আর্থিক আয়
income, real	খাঁটি আয়
incidence	করভার
inconvertible	অবিনিমেয়
increment	বৃদ্ধি

indemnity	খেসারৎ, ক্ষতিপূরণ
indent, direct	সরাসরি মাল চালান
indenter's indent	আমদানীকারক বা দালালের মারফৎ মালচালান
index number	সূচক সংখ্যা
individualism	ব্যষ্টিবাদ
industry	শিল্প, শ্রমশিল্প
industrial bank	শিল্পীয় ব্যাঙ্ক
industrial credit corporation	শিল্পীয় ঋণসঙ্ঘ
inflation	বৃদ্ধি, সম্প্রসার
inheritance	উত্তরাধিকার
insolvent	দেউলিয়া
instalment	কিস্তি
insurance	বীমা
interest	সুদ
international	আন্তর্জাতিক
,, court of justice	আন্তর্জাতিক বিচারালয়
internment	অন্তরায়ণ
inverse ratio	বিপরীত হার, ব্যস্ত অনুপাত
investment	ধনবিনিয়োগ
invoice	চালান
irrigation dept	সেচ বা পূর্ত্তবিভাগ
Joint	যৌথ, এজমালি
joint-stock company	যৌথ কারবার
journal (day book)	খসরা বা জাবেদা খাতা

judiciary	বিচার বিভাগ
jurisprudence	ব্যবহার শাস্ত্র
Labour	শ্রম
labour bureau	বিশ্ব শ্রমিক সঙ্ঘ বা পরিষদ
„ , Productive	ফলপ্রসূ শ্রম
„ , Unproductive	নিষ্ফল শ্রম
labourer	শ্রমিক
laissez-faire	নির্বিরোধ নীতি
land mortgage bank	জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক
land tenure	প্রজাস্বত্ব
large-scale production	বহু উৎপাদন
law	বিধি, নিয়ম, সূত্র
league of nations	রাষ্ট্রসংঘ
lease	পাট্টা
ledger	খতিয়ান
ledger (personal)	নামে খরচের হিসাব
legacy	উত্তরদান
legal tender	আইনসম্মত প্রকৃষ্ট মুদ্রা
legislative	ব্যবস্থাপক
legislature	ব্যবস্থাপক সভা
leisure class	পরশ্রমজীবী
les majesty	রাজাপমান
letter copy book	চিঠির নকল বহি
liability	দেনা

liability, contingent	সম্ভাব্য দেনা
,, , limited	সীমাবদ্ধ দায়িত্ব বা দেনা
liquidation	দেউলিয়া
localisation	স্থানীয়করণ
long term loan	দীর্ঘকালীন ঋণ
luxuries	ব্যসন, বিলাসদ্রব্য

Machinery	কলকব্জা
management	পরিচালন
managed currency	নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা
mandate	আজ্ঞাপত্র, শাসনাধিকার
manufacture	শিল্পজদ্রব্য, নির্ম্মাণ
margin	সীমা
marginal utility	প্রান্তীয় উপযোগ
market firm	বাজার গরম
,, weak	বাজার নরম
mass	জনসাধারণ
maturity	মুদ্দতী হুণ্ডির মেয়াদ
mean	মধ্যম
,, , Arithmetic	যোগোত্তর মধ্যম
,, , Geometric	গুণোত্তর মধ্যম
median	মধ্যমা
medium	বাহন
,, of exchange	বিনিময় বাহন
memorandum	স্মারক লিপি
mercantalism	বাণিজ্যতন্ত্র

mercantile marine	পণ্যবাহী নৌবহর
metal, Overvalued	অতিমূল্যীকৃত ধাতু
,, , Undervalued	উনমূল্যীকৃত ধাতু
metoir system	আধিব্যবস্থা
middleman	মধ্যস্থ ব্যক্তি, ফড়ে
minimum wage	নিম্নতম মজুরী
mint	টাকশাল
mobility	গতিশীলতা
monarchy	রাজতন্ত্র
" , absolute	যথেচ্ছাচার রাজতন্ত্র
" limited	নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র
money	অর্থ
monopoly	একচেটিয়া
moratorium	সাময়িক ঋণরেহাই
Nation	রাষ্ট্রজাতি
national dividend	জাতীয় লভ্যাংশ
national debt	জাতীয় ঋণ
nationalisation	জাতীয়তা, আধিজাত্য
naturalization	দেশাঙ্গীভূত
necessaries	অপরিহার্য্য দ্রব্য
net	নীট, আসল
nihilism	অনীশ্বরবাদ
nominal	আপাত। নামমাত্র

nomination	মনোনয়ন, নিয়োজন
not-negotiable	না-বন্দোবস্তী
Octroi	চুঙ্গী
official Assignee	সরকারী তত্ত্বাবধায়ক
order book	অর্ডার বহি
over-population	অতিপ্রজন
over productinn	অত্যুৎপাদন, উৎপাদনবাহুল্য
Panic	উদ্বেগ
paper money	কাগজী মুদ্রা
par	বরাবর, সমান
par, Above	অতিরিক্ত মূল্যে
par, At	সম মূল্যে
par, Below	উন মূল্যে
parity	সমতা
partner	অংশীদার
partnership	অংশীদারী
payee	প্রাপক
payer	দেনদার, দায়ক
per cent	শতকরা
perishable	জরিষ্ণু
periodicity	পর্য্যাবৃত্তি
permanent advance	স্থায়ী জিম্মা তহবিল
personal ledger	নামে খরচের হিসাব

politics	রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি
planned economy	নিয়ন্ত্রিত অর্থ-ব্যবস্থা
planning, Economic	আর্থিক পরিকল্পনা
population	লোকসংখ্যা. প্রজন
possession	দখল
preference	পক্ষপাত
preference, Imperial	সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত
preferential	পক্ষপাতমূলক
price level	মূল্যরেখা
prime cost	প্রত্যক্ষ ব্যয়
principal	মূলধন, আসল, প্রধান
production	উৎপাদন
produce	উৎপন্ন
productive	ফলপ্রসূ, সফল
profit	লাভ, মুনাফা
progressive	বর্দ্ধিষ্ণু
proletariat	পরার্থশ্রমী
promissory note	কোম্পানীর কাগজ। প্রতিজ্ঞাপত্র
proportional	আনুপাতিক
prospectus (of a Co.)	যৌথ কারবারের অনুষ্ঠান পত্র
protection	সংরক্ষণ
„ policy	সংরক্ষণ নীতি
provincial	প্রাদেশিক

proxy	প্রতিনিধি
public	সাধারণ
public finance	জাতীয় অর্থবিজ্ঞান
public income	জাতীয় আয়
Quantity theory	সংখ্যা-তত্ত্ব
quasi-rent	উপকর
Race	জাতি
rapidity of circulation	প্রচলন গতি
rate	হার, দর
rate of exchange	বিনিময় হার
ratio	অনুপাত
rationalisation	সংস্কারনৈপুণ্য
raw material	কাঁচামাল
realisation	উশুল, আদায়
reciprocal	পারস্পরিক
reciprocity	পারস্পর্য্য, দোতরফা, ব্যতিহার
referendum	সাধারণের মতগ্রহণ
relative	আপেক্ষিক
rent	খাজনা, ভাড়া, কর
rent, Consumer's	ভোগকর
rent, Customary	মামুলী কর
rent, Dead	তামাদি কর
rent Producer's	উৎপাদন কর

rental	জমাবন্দি
republic	গণতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র
reserve	তহবিল, সঞ্চিত ভাণ্ডার
resident	বাসিন্দা
return	উৎপন্ন, আদায়
return, Constant	স্থির উৎপন্ন
return, Diminishing	নিম্নগ-, ক্ষয়িষ্ণু-, কমতি-, উৎপন্ন
return, Increasing	বিবর্দ্ধমান-, উর্দ্ধগ-, বাড়তি-, উৎপন্ন
revenue	রাজস্ব
rise and fall	উচ্চয় অবচয়, ওঠানামা
risk	ঝুঁকি

Sample	নমুনা
saving	সঞ্চয়, পুঁজি
scheme	পরিকল্পনা
security	জামিন, নিরুদ্বেগ
security, gilt-edged	স্বর্ণতুল্য জামিন বা দলিল
„ , marketable	বিক্রয়যোগ্য জামিন বা দলিল।
seigniorage	মুদ্রানির্ম্মাণ ব্যয়, বাণী
separation of powers	ক্ষমতা-বিভেদন
share	অংশ, শেয়ার
share-certificate	অভিজ্ঞানপত্র
share-holder	অংশীদার
sinking fund	কর্জ্জশোধের তহবিল, পরিশোধ তহবিল
socialism	সমাজতন্ত্র, সমষ্টিবাদ

sociology	সমাজবিজ্ঞান
sole agent	একমাত্র বিক্রেতা
specie	ধাতু
specie point	স্বর্ণনিকাশ বিন্দু
speculation	ফট্কা
speculation business	কপাল্ ঠুকা ব্যবসায়
stability of currency	মুদ্রাস্থায়ীকরণ
standard	মাপ, মান
standard of living	জীবনযাত্রার স্তর বা মান
standard money	আদর্শ মুদ্রা, পূর্ণ মুদ্রা
standardised	মাপ মোতাবেক
state, Mandated	আজ্ঞাধীন রাষ্ট্র
state, Neutralized	নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
state, Protected	সংরক্ষিত রাষ্ট্র
state, Vassal	অনুগত রাষ্ট্র
state, Union of	রাষ্ট্র সম্মেলন
stationary	স্থিতিশীল, বর্দ্ধিষ্ণু
statistics (figures)	পরিসংখ্যা, সংখ্যা
statistics (science)	সংখ্যাশাস্ত্র
stock	কোম্পানীর কাগজ, মূলধন, পুঁজি
strike	ধর্ম্মঘট
subsidiary coin	আনুসঙ্গিক মুদ্রা, অপ্রকৃষ্ট মুদ্রা
subsidy	সাহায্য, সরকারী অর্থানুকূল্য
suffrage	নির্ব্বাচনাধিকার

suffrage, Universal	সার্ব্বজনীন নির্ব্বাচনাধিকার
supply	যোগান, সরবরাহ
supply-curve	যোগান-রেখা
suspense account	নামে খরচ, যাহা মঞ্জুরী বিল মুলে চূড়ান্ত হয়'নাই
Tariff wall	শুল্ক প্রাচীর
tax	কর
tax, Direct	প্রত্যক্ষ কর
tax, Double	দ্বিকর
tax, Indirect	পরোক্ষ কর
tender	মাল খরিদের জন্য বাজার যাচাই
Base, token coin	হীনমুদ্রা, নিদর্শক মুদ্রা
tolerance (of the mint)	ক্ষয়সীমা
trade cycle	ব্যবসাচক্র
trade depression	ব্যবসা মন্দা
trade union	শ্রমিকসঙ্ঘ
transaction	কারবার, লেনদেন
transfer entry	পাল্‌টা জমাখরচ
treasury	কোষাগার, খাজানাখানা
treaty	সন্ধি
tribe	জাতি সম্প্রদায়
trust	সঙ্ঘ
Unanimous	সর্ব্ববাদিসম্মত
unearned increment	অনুপার্জ্জিত লাভ

unemployed	বেকার
unstable	অপ্রতিষ্ঠ, অনিশ্চিত
usurer	কুসীদজীবী
utility	উপযোগ, কার্য্যকারিতা
utility, Derived	উদ্ভূত (আগত) উপযোগ
utility, Total	মোট উপযোগ
Vocational training	অর্থকরী শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা
velocity of circulation	প্রচলন গতি
vendibility	বিক্রয়-সাধ্যতা
vested interest	প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ, কায়েমী স্বার্থ
Wage	মজুরী ও মাহিনা
wants	অভাব
ware house	গুদাম
wealth	ধনদৌলত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ
weigh book	ওজন বহি
wholesale	পাইকারী
will	ইচ্ছা, সংকল্প, চরমপত্র
workmen's insurance	শ্রমিক বীমা
workshop	কারখানা